Vol. 31 | No. 2 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গোরা উপন্যাসে ধর্ম ও রাজনীতি

Volume	31
Issue	2
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	February 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i2.1
Pages	1-42
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গোরা উপন্যাসে ধর্ম ও রাজনীতি

নীলিমা ইব্রাহিম

পৃথিবীর বুকে মানবসমাজে যতো প্রকার নীতি প্রচলিত আছে, যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, যুদ্ধনীতি, মৈত্রী-নীতি এমনকি ধ্বংসেরও একটা নীতি বর্তমান; কিন্তু তার ভেতর আপাতঃদৃষ্টিতে সবচেয়ে জটিল ও দুরূহ হচ্ছে ধর্মনীতি অর্থাৎ ধর্মমত ও তার আচরণ বিধি। আইনের যেমন মূল ধারার সাফল্য নির্ভর করে তার প্রয়োগের যথার্থতার ওপর, ধর্মবেত্তারাও মনে করেন ধর্মবিশ্বাসের সাফল্য সর্বাংশে না-হ'লেও অনেকাংশে নির্ভর করে তার আচরণ বিধি, অভ্যাস ও অনুষ্ঠানের ওপর।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যতো মত ততো পথ', তিনি একাধারে জ্ঞানতাপস ও সিদ্ধভক্ত ছিলেন তাই মতের সঙ্গে পথও তাঁর গোচরীভূত ছিল। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ শুধু বিপরীতমুখী মতেরই প্রাধান্য ও প্রাবল্য দেখছি, পন্থানুসন্ধানে অধিকাংশই অন্ধ বা ব্যর্থ। রাজা রামমোহন রায় বলেছেন মত ও পথ পৃথক হলে কি হবে, মূল উপাস্য এক। তাঁর মতে গাভী বিভিন্ন বর্ণের হলেও সকলের দুধই সাদা। সর্বধর্মের মূল কথা 'সত্যানুসন্ধান'। বাংলা-দেশের অনাদরে লালিত পল্লী কবিও বলেছেন: 'নানাবরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ। / জগৎ ভ্রমিয়া দেখিলাম সব একই মায়ের পুত।' পুথি পড়া শাস্ত্রজ্ঞ কি এমন সহজ সত্য এমন ভাবে উচ্চারণ করতে পারেন নির্দ্বিধায়? চণ্ডীদাস বলেছেন: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' নিষ্ঠাবান পূজারী ব্রাহ্মণ কোন অহং শক্তিবলে দেবদ্বিজে ফিরিয়ে এ কোন হৃদয় কন্দর উত্থিত সত্য বাণী উচ্চারণ করলেন। আবার আধুনিক কালের বিপ্লবী কবি বল্লেন—'মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।' কি সদ্ বলিষ্ঠ উচ্চারণ, এর তুলনা কোথায়?

প্রাচীন কালের ভারতীয় ঋষিরা বলেছেন, 'যথা ধর্মঃ তথা জয়ঃ' —যেখানে ধর্ম পালিত হয় সেখানেই বিজয়, কিন্তু এই ধর্ম কি? ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি খুঁজতে গেলে দেখি 'ধৃ' ধাতু থেকে অর্থাৎ 'ধারণ' থেকে ধর্মের উৎপত্তি অর্থাৎ যিনি ধারণ করেন তিনিই ধর্ম। কি ধারণ করেন, কাকে ধারণ করেন? ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফললাভের সাফল্য অর্জন মানুষকে ধর্ম ধারণ করেন, না এর থেকে মোহমুক্তি লাভের জন্য এই অনুশাসন। এর উত্তরেই নানা মুনির নানা মত, যতো মত ততোধিক পথ।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মানব, প্রকৃতি, দৃশ্য-অদৃশ্য সকলের অন্তরে সঞ্চরণ করেছেন, অবগাহন করেছেন। অনেক দেখেছেন, জেনেছেন তারও বেশী, এ কারণেই জটিল থেকে জটিলতর চিন্তা-জালের গ্রন্থি তাঁকে মোচন করতে হয়েছে। এক পরিশীলিত শিক্ষিত এবং ধার্মিক অভিজাত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে যুগাগ্রগামী ধ্যানধারণা তাঁকে প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছিল। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন ও প্রচলনের ক্ষেত্রে ছিলেন একজন দিগপাল। সামাজিক ও পারিবারিক প্রথানুযায়ী রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু পিতৃদত্ত উপনিষদ শিক্ষা তাঁর মানস ক্ষেত্র ও হৃদয় দুয়ার উভয়কেই প্রসারিত করেছে। শুধু বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ নয়, বাইবেল কোরাণের বাণীও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাই সমসাময়িক ধর্মরাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল এবং দুধ থেকে ক্ষীর গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

ধর্মকে আমরা নানা জনে নানা ভাবে গ্রহণ করে থাকি। ইহ-কালের শান্তি অথবা পরকালের প্রাপ্তি কিম্বা মুক্তি, ইহকালের অতৃপ্ত বাসনার পরকালে পূর্ণতা লাভ ধর্মাচরণের অন্যতম উদ্দেশ্য। নতুবা যে 'সুরা' ইসলাম নিষিদ্ধ বলেছে তার বেহেশ্তে সরাবন তহুরার নহর বয়ে যায় কেমন করে? অতএব বর্তমানের কৃচ্ছ্রসাধন পরবর্তীতে আনন্দ মার্গ উন্মোচন করবে এমন ধারণাও তো বিরল নয়। পুনায় ভগবান রাজনীশের আশ্রমে হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীর বাহ্যিক দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন তো স্বচক্ষেই দেখে এসেছি। পথে শুয়ে শুয়ে সর্বাঙ্গে সহস্র ব্যক্তির পদরেণু

মেখে গঙ্গাসাগর যাত্রাও তো দেখেছি, মাটির নীচে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে 'আল্লাহ আল্লাহ' করতেও শুনেছি। উপবাস, অনাহার, স্বল্পাহার, কাষ্ঠাসন, মৃত্তিকাশয়নও তো আচরিত ধর্মের অঙ্গ, তবু ব সবই ব্যক্তিবিশেষের স্বনির্বাচিত মোক্ষলাভের পথ। এ পথের কণ্টকে নিজে ক্ষত বিক্ষত হওয়া যায়, কিন্তু অপরকে জড়ানো যায় না।

কিন্তু বর্তমান হিংসা উন্মত্ত পৃথিবীতে চাল-ডাল, লোহা-লক্কড়ের মত ধর্ম ব্যবসাও প্রচলিত হয়েছে। এ ব্যবসা সকল সম্প্রদায়ের যাজক, পুরোহিত মোল্লাদের ভেতরই দেখা যায়। এঁরা অর্থের বিনিময়ে ভক্ত, শিষ্য অথবা মুরীদের ত্রাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ এক সর্বনাশা ব্যবসা, এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরীহ অভাবী লোকেরাই ধনে প্রাণে মরে। অবশ্য অতি উচ্চ শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ডিগ্রীধারী বা পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ সব ফাঁদে পা দিয়ে থাকেন। বর্তমানে ধর্মক্ষেত্রে এ ভণ্ডদের বাজার রমরমার খবর আমরা সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি।

আধুনিক কালের অপর ধর্মাচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে ধর্মকে রাজ-নৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। অবশ্য প্রাচীন পৃথিবীতে অথবা মধ্যযুগেও ধর্ম রাজতন্ত্র অথবা রাজদণ্ড পরিচালিত করতো। ইউরোপে সিংহাসনের ওপর গির্জার প্রভাব এবং প্রাচ্যের গুরু-পুরোহিতের আধিপত্য সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আজকের ধর্মসংপৃক্ত রাজনীতির স্বরূপ পৃথক। আমরা বলি রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যা কিছু করছি সবই ধর্মসাধনের জন্য। এই ধর্মচর্চার ফলশ্রুতি দ্বিখণ্ডিত ভারত, অঙ্গহীন পাকিস্তান।

আয়ার্ল্যান্ডে ধর্মীয় বিদ্বেষের ভিত্তিতে অগুণতি মানুষ আজও প্রাণ হারাচ্ছে। সাইপ্রাসের কাহিনী আমাদের অবিদিত নয়। ইরান-ইরাক আরেক নজির সৃষ্টি করেছে, কে বলবে আজ যে শিয়া ও সুন্নিরা একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত! ভারতের পাঞ্জাবের কাহিনী নিতান্তই লজ্জাজনক।

এ ব্যাপারে আরেকটু পিছন ফিরে দেখা যাক। পরাধীন বৃটিশ ভারতকে দাসত্বমুক্ত করবার জন্য জন্ম হয়েছিল ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের। গ্রহণ করা হল বঙ্কিমের বন্দেমাতরম সঙ্গীত, দেশ-মাতৃকা হলেন স্বয়ং মা ভগবতী। দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষায় বিদেশীদের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম, এ অভিযান, বিচার্য বিষয় বিদেশী কারা? ভারতবর্ষের বুকে প্রথম বিদেশী আর্য জাতি। তারপর কালক্রমে শক, হূন, পাঠান, মোগল কতো জাতিই না এসেছে, কিন্তু এ বহিরাগতরা ভারতে এসে এর জনসমুদ্রে মিশে গেছে। এরা বিশ্বাস করেছেন এরা ভারতীয়। পাঠান মোগলের ভারতের বাইরে কোনও ঠিকানা ছিল না, যেমন ছিল না আর্যদের। আদি বাসস্থানে ফিরে যাবার পেছনের দরজা তাঁরা চিরতরে রুদ্ধ করে এসেছিলেন। অতএব যে নামেই ডাকোনা কেন তাঁরা ভারতবর্ষীয়।

একারণেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন :

এস হে আর্য এস অনার্য
হিন্দু মুসলমান
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খ্রীষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার
এস হে পতিত হোক অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ নীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
(গীতাঞ্জলি : ১০৬)

কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে এসেছিল এ কথা ঠিক কিন্তু সকলের সমমানসিকতা দৃষ্ট হল না। জাতীয়তাবাদের পথ বেয়ে এল সাম্প্রদায়িকতা, এল অস্পৃশ্যতা, ব্রাহ্মণ্যপ্রভুত্ব। এ সময়ে

কংগ্রেসে গোখেল, দাদাভাই নওরোজি, বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলক, অরবিন্দ, প্রভৃতির মতদ্বৈধ ও সংঘর্ষের সংবাদ অনেকেরই জানা আছে। পরবর্তী-তে জওহরলাল নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ একদিকে ; অন্যদিকে বল্লভভাই প্যাটেল, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে বার বার মুক্ত হতে চাইলেও মুক্তি পায়নি। বলিদান দিতে হল বাপুজীকে— জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে। রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতি অর্থাৎ মিছিল, শ্লোগান, জেল-জুলুম থেকে দূরে ছিলেন একথা যেমন সত্য তেমনি অতি মাত্রায় রাজনীতি সচেতন তিনি ছিলেন এ মন্তব্য অধিকতর সত্য। তাঁর রাজনীতি ছিল মানুষের মানবিক অধিকার অর্জন ও প্রদানের রাজনীতি। রাজনীতির নামে মঞ্চে গালভরা বক্তৃতা "ভাইয়ো বহীনো" আর গৃহে তাদের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করার রাজনীতিতে ছিল রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম ঘৃণা।

এমনিই এক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস রচিত। নানা কারণে গোরা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। এখানে উপন্যাসের উপাদানের অভাব নেই তবুও এর মূল চরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে ভারতের দেশমুক্তির আন্দোলন ও হিন্দু-ধর্ম ভিত্তিক চিন্তাধারার ওপর। প্রথাগত আচারসর্বস্ব ধর্মাচরণকেই যেন তিনি উপেক্ষা, এমন কি উপহাস পর্যন্ত করেছেন। এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব মুখরতায় প্রাণ পেয়েছে উপন্যাসের চরিত্রগুলি।

রবীন্দ্রনাথ নব প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী পরিবারেই শুধু জন্ম গ্রহণ করেননি, তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এ সমাজের আচার্য। এঁরা একেশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিকতায় আস্থাহীন। তবে আচারে ব্যবহারে এবং জীবনাচরণে আজ আর ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্যবধান না থাকলেও সেকালে ছিল। হিন্দুরা এঁদের ধর্ম-পতিত বিধর্মী মনে করতেন, এঁরাও হিন্দুদের পৌত্তলিকজ্ঞানে ঘৃণা অথবা অনুকম্পা করতেন। এই বাহ্যিক আচার আচরণে এঁরা অধিকাংশ সময়েই মূল ধর্মবিশ্বাস ও চেতনা থেকে বিচ্যুত হতেন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের বিরূপ সমালোচনা পাই আমরা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসে। ব্রাহ্মণ-শরৎচন্দ্রের কেন জানিনা এ সম্প্রদায়ের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত

স্রষ্টার ধর্মে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করেছেন। আচার-সর্বস্ব ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। হরিমোহিনী ও কৈলাস প্রসঙ্গে কোথায়ও কোথায়ও কৌতুক রসের অবতারণা আছে কিন্তু সেখানে বিদ্রূপের হুল নেই। রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী। মানুষের হৃদয় অনুভূতিকেই তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। প্রাচীন রীতিতে অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় বিধান অথবা গ্রন্থসর্বস্বতা থেকে নবচেতনা লব্ধ গতিশীল মানবাত্মার অনুভূতিকে তিনি অনেক ওপরে স্থান দিয়েছেন। হিন্দুসমাজের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি কিন্তু চণ্ডালিকার হাতে জলগ্রহণকে আনন্দ অধর্ম বলে ভাবতে পারেনি। 'রংরেজিনা' কবিতায় কবি সেই বালিকার শুচি শিল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন:

তোমা শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে
পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের মাঝে।
(পুনশ্চ : রংরেজিনা)

ধর্ম মাথায় রাখবার জিনিস নয়, সে হৃদয়ের ধন। 'গোরা' উপন্যাসের বহু জায়গাতেই এ জাতিভেদ প্রথা বা অস্পৃশ্যতাকে তিনি আক্রমণ করেছেন। কারণ একই স্রষ্টার সৃষ্টি একজন মানুষ অপরকে ঘৃণা করবার অধিকার, ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার পেলো কোথায়? ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নামে এই দাম্ভিকতাকে রবীন্দ্রনাথ ঘৃণা করেছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'শুচি', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি কবিতায় এ-বিষয়ে মর্মস্পর্শী কাহিনীর অবতারণা কবি করেছেন।

সমগ্র উপন্যাসে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ধর্মভিত্তিক দেশপ্রেম, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, অস্পৃশ্যতা, ইংরাজের দাসত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্কের মাধ্যমে যেন বঙ্কিমের সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। আর শেষ পর্যন্ত বিধাতার পরিহাসের ভেতর দিয়ে মানুষের সকল কৃত্রিম বন্ধন ও বেড়াজালের সীমারেখাকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন গোরার জন্ম-কাহিনী প্রকাশ করে।

হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য অহঙ্কারের গর্ব ও আভিজাত্যের ধ্বজা-দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোরা। সমগ্র ভারতের মুক্তির ওকালত-নামা তার হাতে—তা হচ্ছে ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য ও ধর্মবোধ। তবে বিপরীত কোটিতে অবস্থান করছেন হারান বা পানু বাবু।

গোরার ধর্মবোধের সঙ্গে সমগ্র ভারতের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি জড়িত। এ গোরাকে ভীর সাভারকর বা ডক্টর মুঞ্জের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা মধ্যপন্থানুরাগী। এঁরা সকলেই নিজ ধর্মের আদর্শের ভিত্তিতে দেশমাতৃকার বন্দনা করতে চেয়েছেন এবং দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এঁদের কাছে ধর্ম সত্যিই ধারিকা শক্তি। তাঁদের বিশ্বাস ধর্মীয় বিধান, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুই পালনীয় নতুবা মুক্তি আসবে না। অথচ গোরার রাজনীতিতে আছে দরিদ্র জনসাধারণ। গোরা তাদের অন্ন স্পর্শ করবে না, কিন্তু তাদের মুক্তি চায় —

এই সব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা, এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—-ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।
(চিত্রা : এবার ফিরাও মোরে)

অপর পক্ষে হারান বাবু ব্রাহ্মসমাজভুক্ত আদর্শ যুবক। নব-আলোকিত পাশ্চাত্যের সকল কিছু তাঁর কাছে আদর্শ-স্থানীয়। ইংরেজ মাত্রেই তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষ এবং শক্তিধর, ইংরেজকে অসন্তুষ্ট করে দেশমুক্তির কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আত্মার পরিশুদ্ধি বিধানের জন্য সকল প্রকার হিন্দুয়ানী কুসংস্কার অবশ্য বর্জনীয়। এতে যদি পরধর্ম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় তাতেও অপরাধ নেই। গোরার পেছনে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছেন সুচরিতার মাসী হরিমোহিনী। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে এই আচারনিষ্ঠ অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাকে লেখক বিন্দুমাত্র বিদ্রূপ করেননি। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধ আচার-সর্বস্বতার অভ্যাস তাঁর জীবনকে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে। তিনি না পেরেছেন অপত্যস্নেহ পরিত্যাগ করতে না পেরেছেন গোপীবল্লভের পায়ে আত্মবিসর্জন দিতে। লেখক তাঁকে নিয়ে মাঝেমধ্যে কৌতুক করেছেন কিন্তু এই কৃপার পাত্রীকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নৈব নৈব চ। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব।

পরেশবাবু প্রকৃতপক্ষে সেকালের সমাজের একজন আদর্শ ব্রহ্মবাদী প্রৌঢ়। তিনি ধর্মকে আত্মিক সত্য বলেই উপলব্ধি করেন। মানুষের আত্মানুভূতি বা তার বিবেক তাকে যে পথে পরিচালিত করবে সেই তার সত্যকার পথ। উপনিষদের বাণী 'আত্মানং বিদ্ধি' তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। নিজেকে জানাই তাঁর চরম ও পরম পাওয়া। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই বিশ্বেশ্বর, জীবন দেবতা। তাঁর প্রার্থনা :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
(গীতাঞ্জলি : ১)

তবুও তিনি সামাজিক জীব, সন্তানের দাবিকে অস্বীকার করেননি কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম যে সহজ হবে না সে কথা চিন্তা করে তাঁর পিতৃহৃদয় শঙ্কিত হয়েছে। এক সময়ে দেখতে পাই তিনি সঙ্কুচিত হৃদয়ে পাহাড়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অযথা নিন্দাগ্লানির রসনা স্তব্ধ করবার জন্য।

এ উপন্যাসে সর্বাধিক বিপ্লবী-বিদ্রোহিনী চরিত্র গোরার জননী আনন্দময়ী। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তিনিই জগন্মাতা—যিনি পুত্র স্নেহে গোরাকে বুকে তুলে নেবার পর সকল অহঙ্কার, ধর্মাচার, লোকাচার, সামাজিক ভর্ৎসনা, নিন্দা-গ্লানিকে নত মস্তকে মেনে নিয়েছেন। কবির ভাষায় :

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।
(গীতাঞ্জলি : ৩)

আনন্দময়ী পুত্র-সর্বস্ব স্নেহকাতর এক জননী যাকে সেদিনের সহায় সম্বলহীন নিরুপায় অসহায় ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ যেন বিবেকানন্দের জননী সারদা। তাঁর কাছে কে আমজাদ আর কে নটী বিনোদিনী কোন ব্যবধান নেই, সবাই সন্তান।

আনন্দময়ীর সকল প্রকার স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে দূরে দণ্ডায়মান কৃষ্ণদয়াল। প্রথম জীবনে গোরাকে স্বইচ্ছায় নয়, ইংরাজ প্রভুর ভয়ে গৃহে স্থান দিলেও শাস্ত্রীয় বিধান মতে তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন। সরকারের ভয়ে নিজের মান-সম্মান, এবং প্রাণের শঙ্কায় গোরাকে তার জন্মবৃত্তান্ত জানাতেও পারছেন না। গোরার প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা শুনে ভয়ে শঙ্কায় মুহ্যমান হয়েছেন। একজন অতি সাধারণ দুর্বল লোভী ইংরাজ-পদলেহী সরকারী কর্মচারী গণ্ডীবদ্ধ সমাজের জীব হিসাবে হরিমোহিনীর মত তিনিও আমাদের অনুকম্পার পাত্র।

সহজ, স্বাভাবিক, প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধি-সম্পন্ন বিবেকবান যুবক বিনয়। তার জীবনের একটিই অবলম্বন তা গোরার চুম্বক-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বন্ধুকৃত্য; অপরদিকে আনন্দময়ীকে স্বীয় জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে মাতৃস্নেহের নিবিড় স্বাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হওয়া। ঔপন্যাসিক বিনয়কে আপাতঃদৃষ্টিতে ভীরু, সঙ্কুচিত অথবা গোরার পশ্চাৎ ছায়ামাত্র করে উপস্থাপিত করলেও পরিণামে বিনয় স্বীয় জীবনের প্রেম ও উপলব্ধ আত্মিক সত্যের কাছে আত্মদান করেছে। গোরার বিচ্ছেদ তার বুকে শেলসম বাজলেও সে তার প্রেম ও প্রেমাধার ললিতার অবমাননা করেনি; এমনকি আনন্দময়ী বিয়েতে আসতে পারবেন না জেনে ব্যথা পেয়েছে কিন্তু অনুযোগ পর্যন্ত করেনি। এই বিনয়ের মুখ থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সর্বধর্ম সমন্বিত মানবধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। স্বয়ং কবি যে-ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছেন তারই মুক্ত প্রকাশ বিনয়। পরেশের তত্ত্বানুভূতি ও ব্যাখ্যা আর বিনয়ের সুষ্ঠু বাস্তব আচরণ রবীন্দ্র ধর্মমতকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দান করেছে।

ওপরের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা অতিক্রম করে এবারে আমরা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করবো। উপন্যাসের সুরুতেই পাই : "শ্রাবণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে"।[১] সম্ভবতঃ লেখকের অন্তরে একটি

পরিতৃপ্তি বা পূর্ণতার ছোঁয়াচ লেগেছিল। এ অনুভূতির স্পর্শ আমরা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাতেও পাই। এ কারণে ঐ সকালেই বিনয় শুনতে পেলো :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

এ সঙ্গীত এবং বাউল তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথকে কতোটা বিমোহিত ও প্রভাবিত করেছিল তা অনেকেরই জানা আছে। এই হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীতের মাধ্যমে বিনয়ের অন্তরের অচিন পাখীটিও ডানা ঝাপটা দিয়ে স্বঅস্তিত্বের সংবাদ দিল। সুচরিতা ও পরেশবাবু চলে গেলে বিনয়ের মনে হ'ল "এমন অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা ও চারিদিকের কুৎসিত কলিকাতা মায়াপুরীর মতো হইয়া উঠিল ; যে রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হয়, অসাধ্য সিদ্ধ হয় এবং অপরূপ রূপ লইয়া দেখা দেয়, বিনয় যেন সেই নিয়ম ছাড়া রাজ্যে ফিরিতেছে।"[২] মরমী কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, শিল্পী সবাই এ সত্য অবগত যে এক মাত্র প্রেমের রাজ্যেই নিয়ম নেই। বিনয় আজ সেই জিয়নকাঠির স্পর্শ লাভ করেছে। গোরা-বিনয়ের আনন্দের মিলনক্ষেত্র গোরার বাড়ির ছাদের হিন্দু-হিতৈষী সভায় যোগদানের মুহূর্তে কিন্তু ঔপন্যাসিক আজ দ্বিধাগ্রস্ত এবং শঙ্কিত ; "বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে...বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার মত বল প্রকাশ করে নাই।"[৩] দ্বিধাগ্রস্ত বিনয়ের মনোভাব এর চেয়ে সুন্দরতর ভাবে প্রকাশ সম্ভব ছিল কি?

গোরার দৈহিক গড়ন বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন, "চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো"[৪] আর বিনয় "সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র, অথচ উজ্জ্বল। স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।"[৫] এই চারিত্রিক পটভূমিকায় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরেশবাবু ও কুমারী সুচরিতাকে দেখে অবিনাশ যখন অকারণে ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা করলো তখন বিনয় প্রতিবাদী হ'ল। কিন্তু গোরার উত্তর, "ব্রাহ্ম হয়ে বাহাদুরি করবার সখ যাদের আছে অব্রাহ্মরা তাদের সবকাজেই ভুল বুঝে

নিন্দে করবে এটুকু দুঃখ তাদের সহ্য করতেই হবে, তারাও বুক ফুলিয়ে বেড়াবে আর তাদের বিরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন বাহবা দিয়ে চলবে জগতে এটা ঘটে না, ঘটলেও জগতের সুবিধে হতো না।"৬

দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মত শুধু চিবুকের হাড় নয়, তার অন্তরের অর্গলও চিরতরে রুদ্ধ। এ ধরনের দেশপ্রেম ও ধর্মবোধ সেদিন বিরল ছিল না, আজও নেই। ভীর সাভারকর তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—'When there is a question of nationality there is no question of humanity' জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে মনুষ্যত্ববোধ অবান্তর। একথাটা কি ধর্মনিরপেক্ষ উদারহৃদয় দেশপ্রেমিক মানবদরদীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব? গোরার মাধ্যমে সেই রক্ষণশীল, দাম্ভিক ব্রাহ্মণকেই ঔপন্যাসিক উপস্থাপিত করেছেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরেশবাবুর গৃহে বিনয়ের যাতায়াত সম্পর্কে গোরার মন্তব্য শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করেছে, "বিশেষতঃ ওঁরা হলেন শিকারী প্রাণী, ওঁদের ভিতরকার ব্যাপার জানতে গিয়ে শেষ কালে এতোদূর পর্যন্ত ভেতরে যেতে পার, যে তোমার টিকিটি পর্যন্ত দেখবার জো থাকবে না।"৭ এ উক্তি কি রাজা রাধাকান্ত দেবের উক্তির প্রতিধ্বনি? কারণ তৎকালে ব্রাহ্ম মন্দিরের উপাসনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করতে পারতেন। অনেক অব্রাহ্ম যুবক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কুমারী যুবতী তরুণী দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হতেন। অবশ্য তাঁদের ভেতর কেউ কেউ যে আর স্বধর্মে ফিরে আসতেন না একথাও সত্য। তবুও এ উক্তি শোভন নয়। সুদক্ষ কারিগর গোরার চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন।

গোরার মতে "হৃদয় জিনিসটা অতি উত্তম। কিন্তু সকলের চেয়ে উত্তম নয়।"৮ হৃদয়ের চেয়েও উত্তম কিছুর সন্ধান কি গোরা পেয়েছিল? অন্যত্র বিনয়, "বিনয়ের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল তাই তর্কের সময় সে একটা মতকে খুব উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে, কিন্তু ব্যবহারের বেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশী না মানিয়া থাকিতে পারে না।"৯ গোরা যেমন আচারভ্রষ্ট আনন্দময়ী-স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে না কারণ তিনি অচ্ছ্যুৎ লছমিয়ার হাতে জল খান তেমনি বিনয় বলে, "তোমার অন্ন যে আমার অমৃত নয় এ কথা কোন শাস্ত্রের প্রমাণেই স্বীকার করিব না।"১০ দেশমাতৃকার বন্দনায় কৃতসংকল্প বহু স্বদেশ-প্রেমিকই গর্ভধারিণীকে অপমান করতে সঙ্কোচবোধ করেননি। গোরা

ও বিনয়ের মনোজগতের ব্যবধান এভাবে আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। গোরার নিত্য উপদেশ, "বিনয় পদে পদে তাহাদের দলের ভারতবর্ষের অনেক নিষেধ মানিয়াছে। অনেক সময় দ্বিধাবোধ করিয়াছে তবু মানিয়াছে। আজ তাহার মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধেরই মূর্তি।"[১১] আজও ভারতের বহু স্থানে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যবধান যত্রতত্র দৃষ্টি গোচর হয়। এ অস্বস্তিকর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথকে বার বার পীড়িত করেছে। মহাত্মা গান্ধীকে হরিজন আন্দোলন করতে হয়েছে কিন্তু আজও অশিক্ষিত সমাজে সর্বজাতির পংক্তি ভোজন অচল। এ কারণে গোরা মুসলমান ছেলেকে আশ্রয়দান-কারী সূত্রধরের গৃহে জলগ্রহণ করতে পারলো না। দেশের আপামর জনসাধারণকে ঘৃণা করে এ কোন দেশোদ্ধার ব্রত, এ স্বাদেশিকতাকে রবীন্দ্রনাথ বহু দূরে রেখেছেন। অবশ্য 'ঘরে বাইরে'র সমস্যা অন্যত্র। তবুও মুসলমান প্রজাদের প্রতি স্বতন্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ বা প্ররোচনা সন্দ্বীপের ছিল।

গোরার প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে কৃষ্ণদয়াল নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তরে গোরা বলেছে সে হিন্দুর ঘরে জন্মেছে সুতরাং সেতো জন্মান্তরের সিংহদ্বার পার হয়েই এসেছে। কৃষ্ণদয়াল বলেছেন, "হিন্দু বল্লেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খ্রীষ্টান সে যে সে হতে পারে কিন্তু হিন্দু! বাপরে ও বড় শক্ত কথা।"[১২] তবে একথা সত্য যার যেটা কর্মফল, নির্দিষ্ট ধর্ম, তাকে একদিন ঘুরে ফিরে সেই ধর্মের পথেই থাকতে হবে—কেউ আটকাতে পারবে না।"[১৩] এ কথা সত্য হিন্দুধর্ম গ্রহণ করা যায় না, হিন্দুকুলে জন্মাতে হয়। সম্ভবতঃ সেখানেই গোরার পরাজয়।

প্রথম যেদিন গোরা পরেশবাবুর বাড়িতে এলো, যেন যুদ্ধ সাজে সেজে এসেছে। ঔপন্যাসিক বর্ণনা দিয়েছেন, "গোরার কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির ওপর ফিতা বাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড় তোলা কটকী সূতা। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।"[১৪] গোরা আজ উত্তেজিত। স্টীমারে ইংরাজ কর্তৃক একজন দেশী লোকের হেনস্থা দেখে এসেছে, সঙ্গে দিশি শিক্ষিত বাবুর হাস্য তামাসা। গোরা ভাবলো

"দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না---নিজেকে নির্মম ভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরববোধ করিতে পারে।"[১৫] গোরার এ ক্ষোভ সত্য। কিন্তু সেই বা কি মূলধন নিয়ে ওই হৃতসর্বস্ব হতভাগ্যের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে; শুধু কি দৈহিক বল? সেও তো মনোজগতে অন্য ভাবে এসব সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে। সে এই শিক্ষিত ব্রাহ্মসমাজকে মনে মনে ইংরাজের চাটুকার রূপে উপলব্ধি করলো। তাই আজ এ যুদ্ধ সাজ।

প্রথম প্রশ্ন বা আক্রমণ এলো বরদাসুন্দরীর কাছ থেকে। তাঁর অবস্থান পরেশবাবুর বিপরীত কোটিতে, কারণ "পৃথিবীতে কোন জিনিসটি ব্রাহ্ম আর কোনটি অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন। সেই জন্যই রাধারাণীর নাম পরিবর্তন করিয়া সুচরিতা রাখিয়াছেন...কোনো ব্রাহ্ম পরিবারে মাটিতে আসন পাতিয়া খাইতে দেখিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আজ কাল ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতা অভিমুখে পিছাইয়া পড়িতেছে।"[১৬] সকল ধর্মের ছুৎমার্গগামিতা নিয়েই লেখকের কৌতুক। বরদাসুন্দরী গোরাকে প্রশ্ন করলেন:

> ...আপনি সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করেন?
> গোরা। আকার জিনিসটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব, আমার মনে এমন কুসংস্কার নেই। আকারকে গাল দিলেই কি সে ছোট হয়ে যায়? আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেছে?
>
> পরেশবাবু মৃদুস্বরে কহিলেন, 'আকার যে অন্তবিশিষ্ট।' গোরা কহিল, 'অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন—নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।'

একি শুধু গোরার কূট তর্কজাল না রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা। তিনি নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী কিন্তু সাকারে শ্রদ্ধাহীন ন'ন। এ শিল্পীর আসক্তি। 'চিত্রা' কাব্যে পাই:

জগতের মাঝে কতো বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী
অযুত আলোক ঝলসিছে নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে
দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর রাগিণী

(চিত্রা : অন্তর্যামী)

বিবেকানন্দ বলেছেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কেনো খুঁজিব ঈশ্বর।

যে আরাধ্যকে যেখানে খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে পেয়েছেন, খণ্ডর মাঝে অখণ্ডকে। তাই তো কবি গেয়েছেন :

সীমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এতো মধুর।

অন্তরের উপলব্ধ সত্যই বড় মাপকাঠি। তেত্রিশ কোটি দেবতা অথবা নিরাকার ব্রহ্মের চরণ কমল হৃদয় বিনা সবই ব্যর্থ, হাস্যকর। সুতরাং সাকার আকারের মীমাংসা রবীন্দ্রনাথ এভাবেই করেছেন, গোরা বা বরদাসুন্দরী কারও পক্ষই তাঁকে অবলম্বন করতে হয়নি। খ্রীষ্টধর্ম নিরাকারে বিশ্বাসী কিন্তু পৃথিবীর সকল গীর্জায় প্রভু যিশু ও মা মেরীর মূর্তিতে সমৃদ্ধ। রোমান ক্যাথলিকেরা ধূপধুনা জ্বালিয়ে ইষ্টমালা হাতে করে ধ্যান করেন। এতে কারও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়না, শুধু গন্তব্য স্থির থাকলেই সিদ্ধিলাভ। গোরার কাছে হিন্দুধর্মের সব দিকই ভাল, মহৎ মহীয়ান। এমন কি অস্পৃশ্যতাকেও গোরা সমর্থন

করে। বিনয় এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বলেছে "এক পেয়ালা চা খেলে যদি সমস্ত দেশকে আঘাত করা হয় তবে সে আঘাতে দেশের উপকার হবে। তার থেকে বাঁচিয়ে চললে দেশটাকে অত্যন্ত দুর্বল বাবু করে তোলা হবে।"[১৭] রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্টতঃ সোচ্চার, বিবাদী কণ্ঠস্বর তাঁর।

বহুদিন পূর্বে আমি তখন স্কুলে পড়ি সম্ভবতঃ ৫৫-৬০ বছর আগের কাহিনী। খুলনার সাতক্ষীরায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় এসেছেন ত্রাণসম্ভার নিয়ে। একজন হিন্দু মহাসভার কর্তা-ব্যক্তি বেশ মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছেন, তিনি আচার্য রায়কে বল্লেন—স্যার, আমার টাকাটা যেন হিন্দুদের দেওয়া হয়। স্যার পি. সি. রায় মুহূর্তকাল ঐ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ওঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আর্তের সেবার নামে এমন অমানবিক কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। সকলের মধ্যস্থতায় ভদ্রলোক ক্ষমা চাইলেন। আমার দাদুর বৈঠকখানায় এ ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল।

মারা গেল নন্দ, সুঠাম দেহের অধিকারী তরুণ খেলোয়াড়, গোরার একান্ত অনুগত বাধ্য কর্মী। তার ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। তার মা ওঝা ডেকেছিল, ডাক্তার ডাকতে দেয়নি। এই মৃত্যু অকস্মাৎ গোরার চেতনায় আঘাত করলো, "সমস্ত জাত মিথ্যার কাজে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রয়েছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ-ভয় যে কতো তার ঠিকানা নেই। জগতে সত্যের সঙ্গে কী রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কি করে? আর তুমি আমি মনে করছি যে আমরা যখন দু'পাতা বিজ্ঞান পড়েছি তখন আমরা আর এদের দলে নেই।"[১৮] গোরার ব্যবহার ও বক্তব্য পরস্পরবিরোধী, কিন্তু সে ধীরে ধীরে এ সামঞ্জস্যহীনতাকে উপলব্ধি করেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেই উল্লেখ করি :

পশ্চাতে রেখেছো যারে
　　সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
　　　　[অপমান]

'গোরা' উপন্যাসে অপর বিতর্কিত বিষয় নারীর অধিকার অথবা অবগুণ্ঠন মোচনের স্বাধীনতা। ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রীশিক্ষায় বিশ্বাসী। অবশ্য

'গোরা' উপন্যাসে যে ব্রাহ্ম সমাজ আমরা দেখেছি তা হিন্দু সমাজেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। তবুও তাঁরা নারীর ব্যক্তিত্বে আস্থাশীল। গোরা কিন্তু এখানেও হিন্দু সংস্কারে শ্রদ্ধাশীল। বিনয় বলেছে:

> আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখিনে।
>
> গোরা। তুমি ইংরেজদের মতো মেয়েদের বুঝি ঘরে বাইরে, জলে স্থলে, শূন্যে, আহারে, আমোদে, কর্মে সর্বত্রই দেখতে চাও? তাতে ফল হবে এই যে পুরুষের চেয়ে মেয়েকেই বেশী করে দেখতে থাকবে—তাতেও দৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট হবে...বিনয়। দেশকে তুমি নারীহীন করে জান সেরকম জানা কখনই সত্য জানা নয়।[১৯]

শতবর্ষ পরে আজও এদেশে গোরার দলই ভারি। বিনয় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, আজও "সত্য মাই কি জয়" বলে ধ্বনি দিয়ে ভারতে সতীদাহ হচ্ছে। স্বয়ং মহিলারা এর সপক্ষে নিজমত দান করছেন। কিন্তু বিনয় প্রগতিশীল, সে মুক্তবুদ্ধিতে দীপ্তমান তাই বলেছে, "দেশের মেয়েদের কেবল তাদের রান্নাবান্না বাটনাবাটার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখছি বলেই মেয়েদের মেয়ে মানুষ বলে অত্যন্ত খাটো করে দেখি—এতে করে আমাদের সমস্ত দেশই খাটো হয়ে গেছে।"[২০] এ উক্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সেখানে নারীপুরুষের সহশিক্ষারই শুধু প্রচলন হয়নি সকল বিষয়ে ছেলেমেয়ে পাঠ গ্রহণের সমঅধিকার লাভ করেছে। 'গোরা' উপন্যাসে নারী প্রগতি ও নারীর অধিকার সম্পর্কিত অনেক কথাই তিনি বিনয় ও ললিতার জবানীতে প্রকাশ করেছেন।

জাতিভেদ সম্পর্কিত আলোচনায় বিনয় বলেছে: "নানা কারণে আমাদের মধ্যে বিকার ও দুর্বলতা ঘটেছে বলেই ভারতবর্ষের আইডিয়াকে আমরা সফল না করে বিকৃত করছি। সে বিকার আইডিয়ার মূলগত নয়। আমাদের ভেতর প্রাণ ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ঘটলেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। গোরা সেইজন্যে বার বার বলে যে, মাথা ধরে বলে মাথাটাকে উড়িয়ে দিলে চলবে না—সুস্থ হও, সবল হও।... আমরা নর দেবতা চাই—আমরা নর দেবতাকে যদি যথার্থই সমস্ত অন্তরের

সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক চাই তাহলে নরদেবতাকে পাবো। আর যদি মূঢ়ের মত চাই তাহলে যে সমস্ত অপদেবতা সকল রকম দুষ্কর্ম করে থাকে এবং আমাদের মাথার উপরে পায়ের ধূলো দেওয়া যাদের জীবিকার উপায় তাদের দল বাড়িয়ে ধরণীর ভার বৃদ্ধি করা হবে।"[২১]

গোরার আবাল্য ভাব-শিষ্য বিনয় ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস আজ তারও নেই, তাই বলেছে—"ব্রাহ্মণ যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে 'পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত'; সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।"[২২] বিনয়ের এ সংলাপ আমাদের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের সংলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। হায়রে ব্রাহ্মণত্বের স্বপ্ন বিলাস। বিনয়ের মুখে এ ধরনের উক্তি শুনে পরেশবাবুর মুখে রবীন্দ্রনাথ তার যোগ্য উত্তর দিয়েছেন, "বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়—অতীতের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলে কি কোন কাজ হবে?"[২৩]

তৎকালীন বহু কংগ্রেস কর্মীর মতো গোরার কাছে দেশও ধর্মের কোনও ব্যবধান নেই, বিস্মিত সুচরিতা জিজ্ঞাসা করেছে, "ধর্মের সঙ্গে দেশের যোগ কী? ধর্ম কি দেশের অতীত নয়?"[২৪] গোরা উত্তর দিয়েছে: "দেশের অতীত যা, দেশের চেয়ে যা অনেক বড় তাই দেশের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর এমনি করে বিচিত্র ভাবে আপনার অনন্ত স্বরূপকেই ব্যক্ত করেছেন। যাঁরা বলেন সত্য এক অতএব একটি ধর্মই সত্য ধর্মের একটি মাত্র রূপই সত্য—তাঁরা সত্য যে এক কেবল এই সত্যটিই জানেন, আর সত্য যে অন্তহীন সে মন্তব্যটা মানতে চান না। অন্তহীন এক, অন্তহীন অনেকে আপনাকে প্রকাশ করেন—জগতে সেই লীলাই তো দেখছি, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই বলছি ভারতবর্ষের খোলা জানলা দিয়ে আপনি সূর্যকে দেখতে পাবেন—সেজন্য সমুদ্রপারে গিয়ে খ্রীষ্টান গীর্জার জানলায় বসবার কোনও দরকার হবে না।"[২৫] সত্য সুন্দরের এ রূপ এ অনুভূতি রবীন্দ্র কাব্যে যত্র তত্র পাওয়া যায়, তবে একের উপাসনার জন্য অপরকে ছোট করবার তো প্রয়োজন নেই। এই যে বিদ্বেষ ঘৃণা মানুষ হয়ে মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সত্যসাধক পরেশবাবুর বুকে এ আচরণ বড় বাজে। তাই তিনি সুচরিতাকে বলেছেন, "আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে অসহ্য

ঘৃণা করছে এবং তাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আসল জিনিসের কথা চিন্তা করে মন সান্ত্বনা মানে কই? সুচরিতা পুনশ্চ গোরাদের কথা প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, আচ্ছা, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাইতো আমাদের দেশের চরম তত্ত্ব ছিল। পরেশবাবু কহিলেন, সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘৃণাও নেই, সমদৃষ্টি রাগ দ্বেষের অতীত, মানুষের হৃদয় এমনতরো হৃদয় বিহীন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেইজন্যে আমাদের দেশে এরকম সাম্যতত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও নীচ জাতকে দেবালয়ে পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাম্য না থাকে তবে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী।"[২৬] ন্যায় দর্শন হৃদয় দর্শন নয়। রবীন্দ্রনাথ 'শুচি' কবিতায় বলেছেন:

প্রভাত কি রাত্রির অবসানে
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছো বাণী
তখনি এসেছে প্রভাত
যাও তোমার ব্রত পালনে।
(পুনশ্চ : শুচি)

নৈয়ায়িকের জীবন দর্শন আর মানবতাবাদীর জীবন দর্শনে বহু ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ জাগরিত চিত্তের অনুভূতি তাই অতীত ভারতের অন্তঃসারশূন্য বড় বড় বুলির প্রতি বা মানুষের কোনও মঙ্গল আনে না, তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। পরেশবাবু এখানে উচ্চকণ্ঠ, নির্ভীক। হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্ব অস্পৃশ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ঘৃণা করেছেন।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশের নারী সমাজের করুণ অবস্থার কথা এ উপন্যাসে এসেছে। শিক্ষিতা সুচরিতার হাত পা বাঁধা অবস্থা, চঞ্চলা ললিতাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য পানুবাবুর হীন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বহন করে না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালী মেয়েদের মনুষ্যেতর অবস্থান বিনয়কে বেদনার্ত করেছে। নৈহাটী স্টেশনের একটি ঘটনার বর্ণনা করেছে বিনয়, বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় এক ভদ্রলোক চলেছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, বুকে শিশুসন্তান চাদর জড়ানো। এ দৃশ্যের কথা উল্লেখ করে বিনয় বলেছে, আমার

এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, সমস্ত বাংলাদেশে কি রৌদ্র কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই।"[২৭] এর চেয়ে সংক্ষেপে এমন ব্যাপক মন্তব্য করা কি আর কোনও ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভবপর হতো? এ উক্তি আজও সত্য। অতঃপর বহু স্থানে নারীর অবস্থান ও অধিকার নিয়ে প্রসঙ্গের অবতারণা আছে।

ধীরে ধীরে ঔপন্যাসিক পরিণামের জন্য গোরাকে প্রস্তুত করেছেন। অত্যাচারী জমিদারের নায়েব মাধব চাটুজ্জে তাকে অন্ন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে আজ গোরার ব্রাহ্মণের অন্নের প্রতি আসক্তি দেখা গেল না। তবে হৃদয় বিকাশের ভিত্তিমূল নড়ে ওঠলো, "পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ানক অধর্ম করিতেছি। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে। যাই হোক এ আচার বিচার ভালমন্দর কথা পরে ভাবিব কিন্তু এখন তো পারিলাম না।"[২৮] এই প্রথম গোরার মন শুষ্ক ধর্মাচরণের প্রতি বিমুখ হ'ল।

অপরদিকে স্টীমারে আসবার সময় বিনয় ললিতার চিদশক্তির মহিমা উপলব্ধি করলো। মা আনন্দময়ী ব্যতীত বিনয় অন্যকোনও রমণীসত্তায় আগ্রহী বা শ্রদ্ধাশীল কোনটাই ছিল না, "কিন্তু ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারী এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহঙ্কার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।"[২৯] আপন অন্তরস্থিত এই প্রেমানুভূতি বিনয়কে যে হৃদয় ঐশ্বর্য দান করেছিল তার বলে বিনয় সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহসী হ'ল; ললিতার সম্মান রক্ষা করতে কৃতকার্য হ'ল। এ অনুভূতি গোরার এসেছিল যেদিন ভাগ্য তাকে ভারতের শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে আয়ার্ল্যাণ্ডে ছুঁড়ে দিল। সেদিন গোরা মমতাময়ী নারীর কাছে হাত পেতেছে—শিব চিরকাল অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী, ভারতের এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলেও প্রকাশ্য দলীয় রাজনীতিকে তিনি কোনও দিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। তাঁর বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ তাঁকে আন্তর্জাতিক করেছে। এ নিয়ে তাঁকে কম সমালোচনা শুনতে হয়নি। তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতায় এ নিষ্ঠুর রাজনীতির জবাব চেয়েছেন তিনি বিশ্বনিয়ন্তার কাছে:

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো
[প্রশ্ন]

গোরা জেল থেকে মাকে লিখেছে, "যাহারা দণ্ড পায় না, দণ্ড দেয় তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদীরা ভোগ করিতেছে; অপরাধ গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই। যাহারা জেলের বাহিরে আরামে আছে তাহাদের পাপের ক্ষয় কবে কোথায় কেমন করিয়া হইবে তাহা জানি না।"[৩০] এর শেষ পাপস্খালন আমরা দেখেছি, আজও দেখে চলেছি কিন্তু তা রমণীয় নয়। সহিংস বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের সে সর্বনাশা পরিণাম দেখিয়েছে।

এমন ভাবগম্ভীর বিতর্কমূলক উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাঁর আঙ্গিক ধর্ম পালনে যথেষ্ট সতর্ক, সুযোগ পেলেই সরস রসিকতাটুকু করে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে সহজতর করেছে। মহিমের পর্দানশীনা স্ত্রী লক্ষ্মীমণি যাকে পর্দার ফাঁক দিয়েও আমরা মুহূর্তের জন্য দেখতে পাইনে তাঁর সাংসারিক অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "এখানকার বিধান কর্তাও লক্ষ্মীমণি এবং নিম্ন আদালত হইতে আপিল আদালত পর্যন্ত সমস্তই লক্ষ্মীমণি, এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়াল তো ভেদ ছিলই না, লেজিসলেটিভ ও তাহার সহিত জোড়া ছিল।"[৩১] এ ভাবে অন্তঃপুর-বাসিনীর স্বীয় সাম্রাজ্যের আধিপত্যের কথাই বলেছেন। আবার হরিমোহিনীর দেবর কৈলাস সুচরিতার পাণিগ্রহণ প্রস্তাব শুনবার পর অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বাড়িঘরের ইটকাঠ লক্ষ্য করেছে। এমন ছোট খাট স্বস্তিকর মুহূর্তের অভাব নেই।

বাংলার নারীর দুঃখ দুর্দশাকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন হরিমোহিনী ও তার কন্যা মনোরমার কাহিনীর মাধ্যমে। কুলকামিনী মনোরমারা

আজও বাংলার ঘরে ঘরে স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মবিসর্জন দিচ্ছে, স্পর্শকাতর কবি নিজেও কন্যার পিতা ছিলেন এবং জীবদ্দশায় তাদের জীবনাবসান দেখে গেছেন, তাই মুক্তি কবিতাতে পেয়েছি:

রাধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাধা
তিরিশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
(পলাতকা: মুক্তি)

এ দীর্ঘ উপন্যাসে নারী প্রগতির কথা বলতে গিয়ে এই অসহায় নিপীড়িত বিড়ম্বিত মূকজীবদের কথা ঔপন্যাসিক বার বার উচ্চারণ করেছেন। পরেশবাবু সুচরিতাকে কন্যাস্নেহে লালন করেছেন। সে শুধু তাঁর কন্যা নয়, ভাবশিষ্যাও, তাই তার জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে তিনি বিব্রতবোধ করেছেন। পরেশবাবু সম্পর্কে তাঁর স্রষ্টা বলেছেন, "ভূমার সহিত মিলনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম পরেশের চিত্ত সর্বদাই তাহার অভিমুখে ছিল।"[৩২]

হরিমোহিনীকে নিয়ে সুচরিতার পৃথক আবাসগৃহ স্থির করে পরেশ অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন। "সন্ধ্যাকালের বাষ্প কাটিয়া গিয়া যেন নির্মল অন্ধকারের মধ্যে তারাগুলি দীপ্তি পাইতেছিল। সুচরিতাকে পাশে লইয়া পরেশ সেই নিঃস্তব্ধ রাত্রে প্রার্থনা করিলেন—সংসারের সমস্ত অসত্য কাটিয়া পরিপূর্ণ সত্য আমাদের জীবনের মাঝখানে নির্মল মূর্তিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠুক।"[৩৩] 'নির্মল অন্ধকার' কথাটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়।

পরেশ গৃহী, তাই গৃহজীবনের ক্লেদ গ্লানি থেকে তাঁর মুক্তি কোথায়? কিন্তু তিনি কিভাবে এসব সমস্যার মুখোমুখী হয়েছেন সেটুকুই আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয়। ষ্টীমার যাত্রার কাহিনী নিয়ে ললিতার কারণে হারান যখন পরেশবাবুকে ধিক্কার দিয়েছে তখন স্থিরকণ্ঠ উত্তর আমরা শুনতে পাই, "পানুবাবু, কাল্পনিক আশঙ্কাকে আমি স্থান দিইনে এবং অনুতাপের কারণ ঘটেছে কিনা তা তখনই বুঝবো যখন অনুতাপ জন্মাবে।"[৩৪] জীবনের এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে তিনি গভীর মমতায় সুচরিতাকে বলেছেন, "ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই নিজের একমাত্র সহায় করো—তাহ'লে ভুল ত্রুটি ক্ষতির মধ্যে দিয়েও লাভের

পথে চলতে পারবে। আর যদি নিজেকে আধাআধি ভাগ কর, কতক ঈশ্বরে কতক অন্যত্র তাহ'লে সমস্ত কঠিন হয়ে উঠবে।"৩৫ এতো সেই বৈষ্ণব রসতত্ত্বের কথা "এক মন হতে হবে" একটু কম অথবা একটু বেশী হলে নাইয়া পার করবে না। পিতা এবং গুরু এর চেয়ে বড় সত্য আর কি উচ্চারণ করতে পারেন। এই তো প্রকৃত ধর্মবোধ—অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করা এবং তাকে ধারণ ক্ষমতা অর্জন করা. এই তো রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। পরেশবাবুর উচ্চারণে আমরা অনেক সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে খুঁজে পাই। এ যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রুত উপদেশ পুনঃ উচ্চারণ করছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্ম, কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসে সে সমাজের দুর্বলতা ও গ্লানিকে কোথায়ও ঢাকা চাপা দেবার চেষ্টা করেননি। ললিতার ঘটনার অবতারণা করে তাদের সামাজিক মনমানসকে দিবালোকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের স্বঘোষিত অভিভাবক হারান বাবু এমন কি স্বীয় জননী বরদাসুন্দরী—সকলের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়ে ললিতা নিজের অবস্থানের দিকে চোখ তুলে চাইল। কি তার ভবিষ্যৎ? কি তার জীবনের গন্তব্য পথ? তেজস্বিনী পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নয়। ভেবে-চিন্তে সে মেয়ে-স্কুলে শিক্ষকতা করবার সিদ্ধান্ত নিলো, কিন্তু কোথায় সে বালিকা বিদ্যালয়? সুচিদিদিও তাকে ভরসার বাণী শোনাতে পারলো না কারণ ঐ সমাজে দু'টি মেয়ে মানুষ মিলে কিবা তারা করতে পারে? "ললিতা কহিল, দিদি, ও কথা বললে চলবে না। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে থাকবো? পৃথিবীর কোনো কজেই লাগবো না?" এ যেন শতবর্ষ পরে ১৯৮৫ সালে নাইজেরিতে উচ্চারিত ফ্রেদা ব্রাউনের উক্তি। নারী জনোচিত স্থৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তায় সে সুচরিতার অগ্রগণ্যা। সুধীর যখন তাকে তার আচরণের ইঙ্গিত দিয়েছে তখন যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎ-পাত হ'লো। "ললিতা মুখ লাল করিয়া বলিল, এ আমার সেই ষ্টীমার যাত্রার শাস্তি। যদি অবিবেচনার কাজ করেই থাকি তবে ভাল কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত করবার পথ আমাদের সমাজে একেবারেই বন্ধ বুঝি? আমার পক্ষে সমস্ত শুভকাজ এ সমাজে নিষিদ্ধ? আমার এবং আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির এই প্রণালী তোমরা ঠিক করেছো?"৩৬ "সুচরিতা ললিতার হাত ধরিয়া কহিল, সহ্য করাতে তো

অপমান নেই, বাবা কেমন করে সব সহ্য করেন দেখেছিস তো? ললিতা কহিল, কিন্তু সুচিদিদি আমার অনেক সময় মনে হয়। সহ্য করার দ্বারা অন্যায়কে যেন স্বীকার করে নেওয়া হয় অন্যায়কে সহ্য না করাই হচ্ছে তার প্রতি উচিত ব্যবহার।"৩৭ এখানে স্রষ্টা আত্ম গোপন করেননি, আমরা বিশ্বকবির ছন্দোবদ্ধ বাণী স্মরণ করতে পারি:

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ব্রাহ্মসমাজের ভেতরের কুসংস্কার ও মালিন্য দেখে বিনয় মর্মাহত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আনন্দময়ী তাকে বলেছেন, "গোরা একটা কথা বার বার বলে সেটা আমার কাছে খুব খাঁটি মনে হয়। সে বলে যেখানে ভেতরে কোথায়ও একটা অন্যায় আছে, সেখানে বাইরে শান্তি থাকাটাই সকলের চেয়ে অমঙ্গল। ওঁদের সমাজে যদি অশান্তি জেগে থাকে তাহ'লে তোর অনুতাপ করবার কোন দরকার দেখিনে। দেখবি তাতে ভালোই হবে। তোর নিজের ব্যবহারটা খাঁটি থাকলেই হ'ল।"৩৮ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণতা, দলাদলি, নেতৃত্বের লড়াই, রাজনৈতিক কোন্দলের মত গোষ্ঠি স্বার্থে পৃথক সম্প্রদায় গঠন সবই রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, মর্মাহত হয়েছেন। 'নববিধান সমাজ', 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' সবই তো তাঁর গোচরীভূত, অনুভব করেছেন ধর্মের চেয়ে আচার ও ব্যক্তিস্বার্থ দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। হয়ত বা এ কারণেই আজ ব্রাহ্ম সমাজ লুণ্ঠিত। ললিতার স্টীমার যাত্রাকে কেন্দ্র করে যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেখানে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। সেই সঙ্গে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মতামত ললিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। "ললিতা কহিল,...পানুবাবু মনে করেছিলেন তিনিও তাঁর সমাজ আমাকে শিকারের জন্তুর মত তাড়া করে একেবারে অতল সমুদ্রের ধার পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, এইখানে আমাকে ধরা দিতেই হবে। তিনি জানেন না, এই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে আমি ভয় করিনে—তাঁর শিকারী কুকুরের তাড়ায় তাঁর পিঞ্জরের মধ্যে ঢুকতেই আমার ভয়।"৩৯ ললিতা তার মনকে, অন্তরের অন্তর্যামীকেই মেনেছে, সমাজের রক্তচক্ষুকে সে গ্রাহ্য মাত্র করেনি। অনুরূপভাবে ভাবাবেগে আকুল হলেও চারিত্রিক ভ্রষ্টতা বিনয়ে নেই। সেখানে সে 'বজ্রাদপি কঠোরাপি', হারান বাবুর সমালোচনার জবাবে বলেছে, "বাইরের ঘটনাকে ভিতরের অপরাধের সঙ্গে আপনারাও যদি

এক আসন দান করেন তবে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে আপনাদের ব্রাহ্ম সমাজে আসবার কী দরকার ছিল?" এভাবেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক মন মানস নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের দুর্বলতাকে গোপন না করে প্রকাশ্যে টেনে এনেছেন। তবে সেখানে শরৎচন্দ্রের মত অহমিকা বা প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা নেই। মোট কথা রবীন্দ্র ধর্ম-বিশ্বাস ছিল পরিলব্ধ আত্মার জাগরণ ও অনুশীলন। বিভিন্ন নামে শত সহস্র ধর্মের প্রবর্তনেও স্বউপলব্ধি ছাড়া এ ধর্মবোধ লাভ সম্ভব নয়।

আহত দ্বিধাগ্রস্ত অথচ কর্তব্য সচেতন বিনয় শেষ পর্যন্ত পরেশবাবুর কাছে তার মনের দ্বার উন্মুক্ত করলো। তার উক্তি আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর নরনারীর যেন অন্তরের কথা। ঔপন্যাসিক এ অনুভূতিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, "আপনাকে সত্য কথা বলি, আগে মনে করতুম আমার বুঝি একটা কিছু ধর্মবিশ্বাস আছে। তা নিয়ে অনেক লোকের সঙ্গে অনেক ঝগড়াও করেছি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জেনেছি ধর্ম বিশ্বাস আমার জীবনের মধ্যে পরিণতি লাভ করেনি। এটুকু যে বুঝেছি সে আপনাকে দেখে। ধর্মে আমার জীবনে কোন সত্য প্রয়োজন ঘটেনি এবং তার প্রতি আমার সত্যবিশ্বাস জন্মেনি বলেই আমি কল্পনা এবং যুক্তি কৌশল দিয়ে এতোদিন আমাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মকে নানা প্রকার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাদ্বারা কেবল মাত্র তর্ক নৈপুণ্যে পরিণত করেছি। কোন ধর্ম যে সত্য তা ভাববার আমার কোনো দরকারই হয় না। যে ধর্মকে সত্য বললে আমার জিত হয় আমি তাকেই সত্য বলে প্রমাণ করে বেড়িয়েছি। যতোই প্রমাণ করা শক্ত হয়েছে ততোই প্রমাণ করে অহঙ্কার বোধ করেছি। কোনদিন আমার মনে ধর্মবিশ্বাস সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে কি না তা আজও আমি বলতে পারিনে কিন্তু অনুকূল অবস্থা ও দৃষ্টান্তের মধ্যে পড়লে সেদিকে আমার অগ্রসর হবার সম্ভাবনা আছে এ কথা নিশ্চিত। অন্ততঃ যে জিনিস ভেতরে ভেতরে আমার বুদ্ধিকে পীড়িত করে চিরজীবন তারই জয়পতাকা বহন করে বেড়াবার হীনতা থেকে উদ্ধার পাব।"[৪০] কোন্ ধর্মপতাকাধারী রাজনৈতিক দলের নেতা এ উক্তি বহির্ভূত? পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে অকপটে বার বার ধর্মান্তরিত হবার কথা স্বীকার করেছেন। আমরা কতো তর্ক বিতর্ক করে স্বধর্ম ঘোষণায় রাজনৈতিক মঞ্চ কাঁপিয়ে তুলি, কিন্তু আত্মদর্শন হয়েছে

ক'জনার ? অপর পক্ষে ললিতা বিনয়কে দীক্ষাগ্রহণে, স্বধর্মত্যাগে বাধা দিয়েছে। কারণ সে পরেশবাবুর কন্যা, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার আছে। সত্য উপলব্ধির ভিত্তি তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গোরা সুচরিতাকে বলেছে, "ভারতবর্ষের লোককে যদি আপনি অব্রাহ্ম বলে দেখেন তাহ'লে তাদের বিকৃত করে দেখবেন এবং তাদের অবজ্ঞা করবেন—তাহ'লে তাদের কেবলই ভুল বুঝতে থাকবেন—যেখানে থেকে দেখলে তাদের সম্পূর্ণ দেখা যায়, সেখান থেকে তাদের দেখাই হবে না। ঈশ্বর এদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন ; এরা নানা রকম করে ভাবে, নানা রকম ভাবে চলে, এদের বিশ্বাস এদের সংস্কার নানা রকম। কিন্তু সমস্তেরই ভিত্তিতে একটি মনুষ্যত্ব আছে, সমস্তেরই ভিতরে এমন একটি জিনিস আছে যা আমার জিনিস, যা আমার এই ভারতবর্ষের জিনিস ; যার প্রতি ঠিক সত্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করে একটি আশ্চর্য মহৎ সত্তা চোখের ওপরে পড়ে—অনেক দিনের অনেক সাধনা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়—দেখতে পাই অনেক কালের হোমের অগ্নি ভস্মের মধ্যে এখনো জ্বলছে, এবং সেই অগ্নি একদিন আপনার ক্ষুদ্র দেশ কালকে ছাড়িয়ে উঠে পৃথিবীর মাঝখানে তার শিখাকে জাগিয়ে তুলবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এই ভারতবর্ষের মানুষ অনেক দিন থেকে অনেক বড় বড় কথা বলেছে, অনেক বড় কাজ করেছে, সে সমস্তই একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে এ কথা কল্পনা করাও সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা, সেই তো নাস্তিকতা।"[৪১] এমন বদ্ধমূল ধারণাকে আয়ত্ত করেই দেশোদ্ধারের পরিকল্পনা। সেই অনুশীলনী সম্প্রদায়ের বজ্রকঠিন ধ্যানের সূচনা। কিন্তু এ যে খণ্ডিতের মুক্তির প্রয়াস, এ সত্য গোরার কাছে এখনো অজ্ঞাত। কিন্তু সুচরিতার প্রেম ও তার প্রতি আকর্ষণে গোরার দেশ প্রসারিত হয়েছে। গোরা বলেছে, "ভারতবর্ষের সৌরমণ্ডলের মধ্যেই তোমার স্থান—তুমি আমার আপন দেশের—কোন ধূমকেতু এসে তোমাকে তার পুচ্ছ দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে শূন্যের মধ্যে চলে যাবে সে কোনমতেই হতে পারবে না। যেখানে তোমার প্রতিষ্ঠা সেইখানেই তোমাকে দৃঢ় করে প্রতিষ্ঠিত করবো তবে আমি ছাড়বো।"[৪২] এই 'আমি' এবং তার অহঙ্কারী অধিকার কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টা আর যাই হোক ধর্ম বা দেশের কল্যাণের জন্য নয়। এ নারী

অধিকারের প্রতি প্রভুর দম্ভোক্তি। আনন্দময়ী ঠিকই বলেছেন, "ধর্মের দিকে যখন সত্যকার টান না থাকে তখন ওইরকমই ঘটে। তখন ধর্মটাও বংশ, মান, টাকাকড়ির মতোই অহঙ্কার করবার সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।"৪৩ এই অহঙ্কারের মদমত্ততাতেই গোরা ধার্মিক। ধর্মান্তরের প্রসঙ্গে ললিতা বিনয়কে বলেছে:

> আপনি যে হেঁট হইয়া নিজেকে খাটো করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন এ অগৌরব আমি সহ্য করিতে পারিব না। আপনি যেখানেই আছেন সেইখানেই অবিচলিত হইয়া থাকিবেন এই আমি চাই। বিনয় কহিল, আপনার যেখানে প্রতিষ্ঠা আপনিও সেখানে স্থির হইয়া থাকিবেন, কিছুমাত্র আপনাকে নড়িতে হইবে না। প্রীতি যদি প্রভেদকে স্বীকার করিতে না পারে তবে জগতে কোন প্রভেদ কোথায়ও আছে কেন?

ঔপন্যাসিকের অন্তরের সকল জানালা দরজা আজ উন্মুক্ত, এই ধর্মীয় প্রভেদ নীতি নিয়ে কতো মল্লযুদ্ধ কিন্তু প্রীতিই পারে একমাত্র সব বিভেদকে স্বীকার করে নিতে এ কথায় তো সব বিভেদের সমাপ্তি। বিশ্ব তাই আজ শান্তি কামনায় মুখর, প্রীতির বন্ধনের জন্য ব্যাকুল। পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও আবিলতা দেখে ললিতা বলেছে, "ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আমি যে সব লোক দেখছি তাদের অনেকের সঙ্গে আমার ধর্মমত এক হ'লেও তাদের সঙ্গে তো আমি কোনও মতেই এক নই—তবুও ব্রাহ্ম সমাজ বলে একটা নামের আশ্রয় নিয়ে তাদেরই আমি বিশেষ করে আপন বলবো আর পৃথিবীর অন্য সব লোককেই দূরে রেখে দেব আজকাল আমি এর কোনো মানে বুঝতে পারিনে।"৪৪ কন্যার শুভাশুভ চিন্তায় পরেশবাবু উদ্বিগ্ন, বিনয়কে বল্লেন, "হিন্দু সমাজ তোমাদের ভার যদি না নেয়, যদি না স্বীকার করে? বিনয় আনন্দময়ীর কথা স্মরণ করিয়া কহিল, তাকে স্বীকার করবার ভার আমাদের নিতে হবে। হিন্দু সমাজ তো বরাবরই নূতন নূতন সম্প্রদায়কে আশ্রয় দিয়েছে। হিন্দু সমাজ সকল ধর্ম সম্প্রদায়েরই সমাজ হতে পারে... হিন্দু সমাজের যদি সেই সঙ্কীর্ণ অবস্থাই হয়ে থাকে তবে সেটা থেকে মুক্তি দেবার ভার আমাদের নিতে হবে; যেখানে ঘরের দরজা জানালা বাড়িয়ে দিলেই ঘরে আলো বাতাস আসে

সেখানে কেউ রাগ করে পাকাবাড়ি ভূমিস্মাৎ করতে চায় না।"[৪৫] হিন্দু সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথেরও এই প্রত্যাশা ছিল, ত্যাগ নয়, গ্রহণই হওয়া উচিত এ প্রাচীন ধর্মানুশাসনের মূল লক্ষ্য।

সুচরিতার সান্নিধ্যে এসে গোরা অকস্মাৎ অবিষ্কার করেছে নারী সত্তাকে। গোরা বলেছে, "তোমাকে দেখে অবধি একটা নতুন কথা দিন রাত্রি আমার মাথায় ঘুরছে। এতোদিন সে কথা আমি ভাবিনি। কেবলই আমার মনে হচ্ছে, কেবল পুরুষের দৃষ্টিতেই তো ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ হবেন না। আমাদের মেয়েদের চোখের সামনে যেদিন আবির্ভূত হবেন সেই দিনই তাঁর প্রকাশ পূর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে একসঙ্গে এক দৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখবো এই একটি আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে। আমার ভারতবর্ষের জন্য আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি—কিন্তু তুমি না হলে প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে বরণ করবে কে? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক।"[৪৬] স্রষ্টা ও সৃষ্টি এখানে একাত্ম, এই সেই গোরা যে পরেশবাবুর অন্দরে প্রবেশের জন্য বিনয়কে ধিক্‌কার দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে নারীর প্রেমময়ী ও কল্যাণী মূর্তিতে শ্রদ্ধা-শীল ছিলেন। তাঁর "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায় নারীর এ দ্বৈত সত্তার প্রকাশ। বিনয়ের দীক্ষা নেওয়া প্রসঙ্গে গোরা ওকে বাক্যবাণে জর্জরিত করেছে। শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিনয় জবাব দিয়েছে—"আগে যখন শুনতুম কেউ ব্রাহ্ম হতে যাচ্ছে মনের মধ্যে খুব একটা রাগ হত। কিন্তু এখন আমার তা হয় না। আমার মনে হয় মতকে মত দিয়ে, যুক্তিকে যুক্তি দিয়েই বাধা দেওয়া চলে, কিন্তু বুদ্ধির বিষয়কে ক্রোধ দিয়ে দণ্ড দেওয়া বর্বরতা।"[৪৭] অথচ কতো সহজে প্রতিদিন আমরা এই বর্বরতাকে উন্মোচিত করছি। শুধু তর্কে নয়, ছুরি, লাঠি, বন্দুক, কামানের সহায়তা নিতেও ইতঃস্ততঃ করছি না। এই তো বর্তমান প্রগতিশীল বুদ্ধিদীপ্ত পৃথিবী। নিজ মতে দৃঢ় থেকে বিনয় বলেছে, "আজ আমি একলা দাঁড়া-লুম। সমাজ বলে রাক্ষসের কাছে প্রতিদিন মানুষ বলি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে এবং যেমন তেমন করে হোক তারই আসন তারই শাসন ফাস গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে তাতে প্রাণ থাক আর না থাক এ আমি কোন মতেই স্বীকার করতে পারব না।"[৪৮] এ রবীন্দ্র নাথের মুখ নিঃসৃত বাণী।

এই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, তর্ক-বিতর্কের মাঝে পরেশবাবু বিনয়কে লিখেছেন, "আমার কেবল এইটুকুমাত্র বলিবার আছে, সমাজকে যদি তোমরা লঙ্ঘন করিতে চাও তবে সমাজের চেয়ে তোমাদিগকে বড় হইতে হইবে। তোমাদের প্রেম তোমাদের সম্মিলিত জীবন কেবল যেন প্রলয় শক্তির সূচনা না করে তাহাতে সৃষ্টি ও স্থিতির তত্ত্ব থাকে যেন।"[৪৯] অর্থাৎ কাম নয়, মোহ নয়, উন্মাদনা নয় শান্ত প্রেমই মানুষকে সকল প্রকার কাঠিন্যকে জয় করবার শক্তি দান করে। কিন্তু গোরা নাছোড়-বান্দা, ধর্মকে পেছনে ফেলে সে আচারকে সর্বস্ব বলে আঁকড়ে ধরেছে। সে ত্যাগ করতে জানে, শাস্তি দিতে জানে কিন্তু গ্রহণ করতে বা ক্ষমা করতে জানে না। তাই বলেছে, "আমি সম্মতি দিতে পারিনে, কেননা আমাদের ধারা কুলকে রক্ষা করে। আমাদের এই কুলে কত শত সহস্র বৎসরের অভ্রভেদী কীর্তি রয়েছে আমরা কোনমতেই বলতে পারব না এখানে প্রকৃতির নিয়মই কাজ করতে থাক। আমাদের কুলকে আমরা পাথর দিয়েই বাঁধিয়ে রাখবো, তাতে আমাদের নিন্দাই কর আর যাই কর।"[৫০] এ বজ্র আঁটুনি কুলের মহিমা রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকে তুলে ধরেছেন।

অথচ একদিন আকস্মিকভাবে জন্মরহস্য উন্মোচিত হওয়ায় এ কুল গোরাকে উত্তাল বারিধি-বক্ষে নিক্ষেপ করলো। এখানেই প্রকৃতির পরিহাস। গোরা হিন্দুধর্ম অনুমোদিত সকল আচারকেই সমর্থন করে, সবই তার কাছে পুণ্য, পবিত্র, পৌত্তলিকতার সপক্ষে সুচরিতাকে বলেছে, "শিল্পে সাহিত্যে এমন কি বিজ্ঞানে ইতিহাসেও মানুষের কল্পনাবৃত্তির স্থান আছে। একমাত্র ধর্মের মধ্যে তার কোনও কাজ নেই একথা আমি স্বীকার করব না। ধর্মের মধ্যেই মানুষের সকল বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ। আমাদের দেশের মূর্তি পূজায় জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কল্পনার সম্মিলন হবার যে চেষ্টা হয়েছে সেটাতে করেই আমাদের দেশের ধর্ম কি মানুষের কাছে অন্য দেশের চেয়ে সম্পূর্ণতর সত্য হয়ে ওঠেনি? সুচরিতা কহিল, গ্রীসে রোমেও তো মূর্তিপূজা ছিল! গোরা কহিল, সেখানকার মূর্তিতে মানুষের কল্পনা সৌন্দর্যবোধকে যতটা আশ্রয় করেছিল জ্ঞান ভক্তিকে ততটা না, আমাদের দেশে কল্পনা জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত। আমাদের কৃষ্ণরাধাই বল, হরপার্বতীই বল, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক পূজার বিষয় নয়, তার

মধ্যে মানুষের চিরন্তন তত্ত্বজ্ঞানের রূপ রয়েছে। সেই জন্যেই রাম-প্রসাদের, চৈতন্যদেবের ভক্তি এই সমস্ত মূর্তিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তির এমন একান্ত প্রকাশ গ্রীস রোমের ইতিহাসে কবে দেখা দিয়েছে?"[৫১] এ যুক্তি গোরারও নয়, তার স্রষ্টারও নয়। এক-সময়ে গিরিশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ তর্কের খাতিরে তর্ক করতেন। তাঁরা বলতেন 'false talk', একে অপরের বিপরীতে কথা বলতেন এ'ও হয়ত কেশব সেন অথবা মহর্ষির সঙ্গে বিতর্কিত কোনও হিন্দু-কুলোদ্ভব রাজার সমগোত্রীয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বা পুনঃপ্রচার যা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করে ঘটেছিল তা না হলে গোটা দেশই ব্রাহ্ম অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যেতো। এ বিতর্ক সেই বিশ্বাসেরই বাহ্য রূপ। হারানবাবুর সঙ্গে তর্কে মেতে সুচরিতা বললো সে হিন্দু। হরিমোহিনীর অন্তরে গোপীবল্লভ জেগে উঠলেন, "এতোদিন তাঁহার পূজা শোকের সান্ত্বনারূপে শান্তভাবে ছিল, আজ তাহা স্বার্থের সাধনরূপ ধরতেই অত্যন্ত উগ্র, উলঙ্গ, ক্ষুধাতুর হইয়া উঠিল।"[৫২] দেবতাকে মানত করা অর্থে তাঁকেও ঘুষের প্রলোভন দেখানো। আসলে আমরা স্বমহিমাতেই দেবতাকে দেখে থাকি।

এ উপন্যাসে নারী নির্যাতনের অপর চিত্র কন্যাদায়গ্রস্ত মহিম। সে বিনয়ের সঙ্গে তার বালিকা কন্যার বিয়ে দিতে চেয়েছে, কারণ বিনয় শুধু ভাল ছেলেই নয় তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে বরপণ ও যৌতুক দিতে হবে না। কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখাত হলে সে গোরার শিষ্য দেশ-উদ্ধারকারী অবিনাশের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তার পিতা মোটা অঙ্কের বরপণ দাবি করেন। আক্ষেপ করে মহিম বলেছে: "আমার তিনকড়েটার বয়স এখন সবে চৌদ্দ মাস। গোড়ায় কন্যা জন্ম দিয়ে শেষে তার ভ্রম সংশোধন করতে সহধর্মিণী দীর্ঘকাল সময় নিয়েছেন। যা হোক ওর বিবাহের সময়টা পর্যন্ত গোরা, তোমরা সকলে মিলে হিন্দুসমাজটাকে তাজা রেখো—তারপর দেশের লোক মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান হোক আমি কোন কথা কব না।"[৫৩] এই তো নিরানব্বই জন গৃহীর আকাঙ্ক্ষা। ধর্মের সবটুকু জড়িয়ে আছে ধনী ও ক্ষমতাবান সমাজপতিদের স্বার্থোদ্ধারের সঙ্গে।

গোরার প্রভাবে আচ্ছন্ন সুচরিতা পরেশকে প্রশ্ন করেছে; "বাবা আমি যে আমার দেশ থেকে জাত থেকে বিচ্ছিন্ন একজন ক্ষুদ্র মানুষ এমন

কথা আমি কেন বলবো? আমি কেন বলতে পারব না আমি হিন্দু? পরেশ হাসিয়া কহিলেন, অর্থাৎ মা তুমি আমাকেই জিজ্ঞাসা করছ আমি কেন নিজেকে হিন্দু বলিনে। ভেবে দেখতে গেলে তার যে খুব গুরুতর কোন কারণ আছে তা নয়। একটা কারণ হচ্ছে হিন্দুরা আমাকে হিন্দু বলে স্বীকার করে না। আর একটা কারণ যাদের সঙ্গে আমার ধর্মমতে মেলে তারা নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় না।"[৫৪] এ কি বহু জনের কাছে রবীন্দ্রনাথের নিজের জবানবন্দী, এখানে তো ভারতীয় অর্থেই হিন্দু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ ধর্মমতের অর্থে কী? কিন্তু সে প্রয়োগ কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গে পরেশ বলেছেন, "হিন্দুসমাজে প্রবেশের কোন পথ নেই অন্ততঃ সদর রাস্তা নেই। খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয় দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের। সুচরিতা কহিল, সব সমাজই তো তাই। পরেশ কহিলেন, না কোন বড় সমাজই তা নয়। মুসলমান সমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্যই উদঘাটিত, খ্রীস্টান সমাজও সকলকে আহ্বান করেছে।...অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত, বেরতে জানত না। হিন্দু ঠিক তার উল্টো। তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ কিন্তু বেরোবার পথ শতসহস্র।...সেই জন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এ রকম ভাবে চললে ক্রমে এ দেশ মুসলমান প্রধান হয়ে উঠবে। তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।"[৫৫] অনেক দুঃখ অনেক বেদনায় ঔপন্যাসিকের এ হৃদয় নিঃসৃত সত্যভাষণ। মুসলমান সমাজের সহজ গ্রহণযোগ্যতাকে চিরকাল রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করেছেন। এ সংলাপে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা নেই আছে মানব চিত্তের স্বাভাবিক গতিবিধির মূল্যায়ন। ধর্মও শিশু চরিত্রের— যে আদর করে হাত বাড়ায় শিশু তার বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, বর্জনধর্মী-তার জন্যই হিন্দুসমাজের এ ক্ষয়িষ্ণুতা।

পরেশের সকল ক্ষোভ যেন তাঁর সুচরিতার সঙ্গে আলাপ-চারিতায় প্রস্রবণের ধারার মত প্রবাহিত হয়েছে, "হিন্দুসমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায় ক্ষয় রোগকেই প্রশ্রয় দেয় তাহলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংশ্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।"[৫৬] পরেশ অথবা তাঁর স্রষ্টার সত্যভাষণ তো

মিথ্যা নয়। আজ শুধু মুষ্টিমেয় সংখ্যক দরিদ্র নিরন্ন পল্লীবাসী আর ধর্মান্ধ ধনীর মাঝেই আচার সর্বস্ব হিন্দুয়ানী টিঁকে আছে। শুধু ইসলাম নয় অন্ত্যজ শ্রেণীর ভেতর আজ মিশনারীরা সানন্দে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করে চলেছে। এই অশিক্ষিত বঞ্চিতেরা প্রভুর প্রেমে অধীর হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে না। জাগতিক মানবোচিত অবস্থান অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রের আকাঙ্ক্ষাতেই এ ধর্মত্যাগ। আজ ধনী-শিক্ষিত সমাজে জাতিভেদ প্রথা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মানবাত্মা যেখানে লাঞ্ছিত অবমানিত সেখানে ধর্মের মূল্য রইল কোথায়? রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত, 'কবি তব মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'। সেই মানব মনোভূমি সর্ব ধর্মের পীঠস্থান। জেল থেকে বেরিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে গোরা পল্লী ভ্রমণে গেছে। সে উপলব্ধি করেছে অশিক্ষিত পল্লীতে সমাজের বন্ধন শিক্ষিতের চেয়ে অনেক বেশী। এদের সকল ক্রিয়াকর্ম সমাজের নিমেষ বিহীন দৃষ্টির ওপর দিয়ে ঘটছে, লোকাচারের বেড়াজালে তারা বন্দী, জড়পিণ্ড, চারিদিকে শুধু নাই, নাই, হা অন্ন হা অন্ন রব। গোরা ভেবেছে "এ জাল ঋণের জাল এ বাঁধন মহাজনের বাঁধন—রাজার বাঁধন নহে, ইহার মধ্যে এমন কোন বড় ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে, সম্পদে, পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না যে এই আচারের অগ্রে মানুষে মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে নিঃস্ব করিতেছে।"[৫৭] এতোদিনে ভারতবর্ষ গোরার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হ'ল। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মের দিকে সে চোখ তুলে চাইতে সক্ষম হ'ল। শেষ পরিণামে পেঁছাবার আগে ঔপন্যাসিক তাকে অহঙ্কার মুক্ত করতে চাইছেন। সাধারণের সঙ্গে তাদের দুঃখ বেদনার মাঝে গিয়ে না দাঁড়ালে দেশকে, ধর্মকে সমাজকে জানা যায় না। গোরা আজ সেই জ্ঞানের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। গোরা বিস্ময়ে দেখলো, "মা বাপের মৃত্যু অপেক্ষা, মা বাপের শ্রাদ্ধ সন্তানের পক্ষে গুরুতর দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া ওঠে।...এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না, বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।"[৫৮] এই ধর্মাচরণে দেশমুক্তি ঘটবে কোন পথে? গোরা, "স্বদেশের গভীরতর যে দুর্বলতার মূর্তি তাহা একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল। যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও

তাহাকে দেখা যায় না। যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকে কোথায়ও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে তাহাই সকলকে চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। পল্লীর মধ্যে, এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানারকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল। তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে, জ্ঞানকে, ধর্মবুদ্ধিকে, কর্মকে এতদিকে এতপ্রকারে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে, নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।"[৫৯] মনে হয় তথাকথিত ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অসারতার পক্ষে আর বলবার কিছু নেই। এখানে নিখিলেশকে স্মরণ হয়। আজ অকস্মাৎ গোরার তীক্ষ্ণ, তীব্র নিষেধের দৃষ্টি এমন সহানুভূতিময় হয়ে উঠলো কেমন করে? গোরার হৃদয় প্রেমের স্পর্শ পেয়েছে। তাই মানুষকে আজ মানুষ হিসেবে দেখতে পাচ্ছে। তাই ধর্মে যদি প্রেম থাকে, গ্রহণ-যোগ্যতা থাকে তাহলেই ধর্ম মানুষকে ধারণ করতে পারে, অন্যথায় নয়।

অশিক্ষিত পল্লী সমাজে স্ত্রী লোকের সংখ্যা কম। আজও বাংলাদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোক স্বল্পায়ু, গোরা তাই ধর্মীয় অনুশাসনকে আঘাত করে বিধবাবিবাহ প্রচলনে আগ্রহী হ'ল। কিন্তু যক্ষপুরীর বাসিন্দারা অনড়, তাদের কথা "বেশত ব্রাহ্মণেরা যখন বিধবা বিবাহ দিবেন, আমরা তখন দিব।"[৬০] অর্থাৎ সেই কঠোর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের নির্দেশের অপেক্ষা। "গোরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে গ্রামে কোনও আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয়, হিন্দুরা এমন হয় না। গোরা বার বার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এতো বড় প্রভেদ কেন হইল। যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। একথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমানেরা এক, কেবল আচারের দ্বারা নয়।"[৬১] রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি আজ আর অভ্রান্ত নয়। সম্ভবতঃ তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে মুসলমানেরা অত্যাচারিত বলে তাদের একতা ছিল। সেখানে ধর্মীয় বন্ধন

গুরুত্ব পেয়েছিল কিন্তু আজ মুসলমানদের পরস্পরের আত্মঘাতী সংগ্রাম দেখে হিন্দুর চেয়ে এদের আর উন্নততর বলে মনে হয় না। মূল কথা ধর্ম আজ আর কোনও মনুষ্য সমাজকে একতার বন্ধনে বাঁধতে সক্ষম নয়। মানুষের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয়েছে। রাজনীতি অর্থনীতি আজ ধর্মের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে। তাই ধর্মের জিগির তুলে রাজ্যশাসন আজ অচল। আরেক নারী নির্যাতন চিত্র কুলীনের সংসার। হরিমোহিনী মনোরমা এদের আগেই দেখেছি। এখন মঞ্চে আবির্ভূত হলেন কৈলাস—হরিমোহিনীর বিপত্নীক দেবর, সুচরিতার পাণি প্রার্থীরূপে। গুরুভার ধর্মীয় তত্ত্বালোচনার ফাঁকে ফাঁকে ঔপন্যাসিক কিছুটা সহজ নিঃশ্বাস নিয়েছেন। কৈলাস সুচরিতার সম্পত্তির ওজন করতে লাগলো, "ঘরের কড়িগুলো বেশ মজবুত শালের এবং দরজা জানালাগুলো আম কাঠের নয় ইহাও সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বাড়ির দেওয়াল দেড় খানা ইঁটের গাঁথনি কি দুই-খানা ইটের তাহাও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না।"[৬২] লোভী কুলীন ব্রাহ্মণের দৃষ্টি বিচার চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। হরিমোহিনীর কথা বিশেষ তার কানে গেল না, "সে মনে মনে কোন একটি অদৃষ্টপূর্ব মূর্তিতে পটলচেরা চোখের সঙ্গে বাঁশির মত নাসিকা যোজনা করিয়া আগুলফ্ বিলম্বিত কেশরাজির মধ্যে নিজের কল্পনাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে-ছিল।"[৬৩] কুশলী দক্ষ ঔপন্যাসিকের সঙ্গে আমরাও সহজ হাসির সুযোগ পেলাম।

সদ্য প্রেমানুভূতিলব্ধ বিনয় গোরাকে অনেক প্রেমের কথা শোনালো, "যে কারণে হউক আমাদের মধ্যে এই প্রেমের আবির্ভাব দুর্বল—সে জন্য আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত।"[৬৪] মাতৃস্নেহ ব্যতীত গোরার জীবনের নিশ্চিদ্র পথ দিয়ে আর কোনও রমণীয় অনুভূতি প্রবেশাধিকার পায়নি। কিন্তু "আজকাল গোরা নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি আকাঙ্ক্ষা, যে একটি পূর্ণতার অভাব অনুভব করিতেছে কোনমতেই কোন কাজ দিয়াই তাহা সে পূরণ করিতে পারিতেছে না। তবু সে নিজে নহে, তাহার সমস্ত কাজই যেন ঊর্ধ্বের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে একটা আলো নাই, উজ্জ্বল আলো, সুন্দর আলো।"[৬৫] এই আলোর প্রত্যাশাই আজ গোরার জীবনের ধ্রুব-তারা। অথচ এতোদিন তার ধারণা ছিল সে হিন্দুধর্মের সহস্র জ্যোতি সবি তার বুকে অবস্থান করছে। শেষ পর্যন্ত গোরার ধৈর্যচ্যুতি

ঘটলো। "গোরা কহিল, সে আমারই তাহাকে আমিই লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি অসম্পূর্ণ, আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব।"৬৬ কিন্তু সুচরিতাকে গৃহে পাওয়া গেল না। সে বিনয়ের বিয়েতে গেছে। উপরন্তু দেখা হ'ল কৈলাসের সঙ্গে, আজন্ম সংস্কারে লালিত গোরা মনে করল, "সে ইহাকে একটি অভিপ্রায়পূর্ণ ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ করিল। তাহাকে যিনি চালনা করিতেছেন তিনি গোরাকে আজ এমনি করিয়াই নিষেধ জানাই-লেন।"৬৭ অন্তরের শত কোটি "না" গোরাকে সাময়িক আশ্বাস দান করলো, তার উপলব্ধি সে সুচরিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এর থেকে মুক্তি প্রয়োজন। সে ব্রাহ্মণ "ব্রাহ্মণকে অনেকের মঙ্গল করিতে হইবে এই জন্যই অনেকের সংসর্গ হইতে ব্রাহ্মণ বঞ্চিত।"৬৮ বাল জনোচিত যুক্তির ওপর এখন গোরার নির্ভর। "হৃদয় গোরাকে হার মানাইয়াছিল, হৃদয়ে প্রতি সেই অপরাধে গোরা নির্বাসনদণ্ড বিধান করিল, কিন্তু নির্বাসনে তাহাকে লইয়া যাবে কে? সে সৈন্য আছে কোথায়?"৬৯ অতএব ব্রাহ্মণের মান্য পন্থা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জেলখানার আচার ভ্রষ্টতা এবং সুচরিতা ঘটিত প্রবৃত্তির আন্দোলন উভয়েরই প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

কৃষ্ণদয়াল গোরাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে নিষেধ করলেন, এমন কি গৃহদেবতার পূজা করতে দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। গোরার বক্তব্য সে কি পূজারী ব্রাহ্মণ রামহরির চেয়েও নিকৃষ্ট। কৃষ্ণদয়াল উত্তর দিলেন, "দেখো পূজা করাই রামহরির জাত ব্যবসা। ব্যবসাতে যে অপরাধ হয় দেবতা সেটা নেন না। ও জায়গায় ত্রুটি ধরতে গেলে ব্যবসা বন্ধই করতে হয়—তাহ'লে সমাজের কাজ চলে না। কিন্তু তোমার সে ওজর নেই, তোমার এ ঘরে ঢুকবার দরকার কী?"৭০

গোরা ক্ষুব্ধ, স্তম্ভিত, কিছুটা অপমানিতও, কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে তর্কে মেতে উঠলো। নিরুপায় কৃষ্ণদয়াল বল্লেন, "আবার তর্ক? আমার মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে তোমার সঙ্কোচ হয় না? এ দিকে বল হিন্দু। বিলাতী কাজ যাবে কোথায়? আমি যা বলি তাই শোন। ও সমস্ত বন্ধ করে দাও।"৭১ পূজারী ব্রাহ্মণের ব্যবসায় যে দেবতা সব রকম লাইসেন্স দিয়ে রেখেছেন তার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনা না দিয়ে পারছি না। আমাদের বাড়িতে আজ থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর আগে লক্ষ্মী পূজা হচ্ছে। আমার বাবার দেবদ্বিজে ভক্তির পরিমাণ ছিল শূন্যের কোঠায়। কিন্তু প্রসাদ গ্রহণে ছিলেন পরমভক্ত। তাই ঘরে ঢুকেই

চেঁচিয়ে উঠলেন—ও কি ঠাকুর মশাই, আপনার শালগ্রাম শিলা নড়ছে কেন? সবাই বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে শুধু নড়া নয়, শালগ্রাম ঠক ঠক করে কাঁপছেন। হঠাৎ পুরুত ঠাকুর হাতজোড় করে কেঁদে উঠলেন, "বড়বাবু আমাকে মাফ করে দেবেন। আজ পর্বের দিন শাল-গ্রাম-শিলা কম থাকায় গুড় দিয়ে নাড়ু বানিয়ে আমরা অনেকেই পূজোয় বেরিয়েছি। ওটায় বোধহয় পিঁপড়ে ধরেছে।" ঠাকুরের প্রায় বাবার পায়ে পড়বার অবস্থা। বাবা হেসে বল্লেন, এ বাড়িতে আপনার কোনও অপরাধ নেই। আপনি পূজা শেষ করুন। আমাদের কাছে নাড়ু আর পাথরে কোনও ব্যবধান নেই, শুধু প্রসাদটুকু ভাল পেলেই হ'ল। পরি-স্থিতি নাজুক দেখে ঠাকুমা হাল ধরলেন, "ঠাকুর মশাই, অন্তরের ভক্তিই সব। ভক্তি থাকলে নাড়ুতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।" কৃষ্ণদয়ালের কথাই ঠিক এই শঠতার জন্য ভগবান তো ঐ ঠাকুরের কোনও শাস্তি বিধান করেননি, ব্যবসায়ীর জন্য দেবলোকেও পেনাল কোড্ নেই।

কৃষ্ণদয়ালের কথায় গোরার মনে সংশয় দেখা দিল। মনে হ'ল তাকে ঘিরে কি যেন একটা রহস্য এ গৃহে ঘনীভূত হয়ে উঠছে। তার মনে হ'ল, "এই যে দেখিতেছি আকাঙ্ক্ষা হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। এ পাথর নড়াইয়া রাখিব কোনখানে, বাবা কেমন করিয়া জানিয়াছেন অন্তরের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ নই। সেই জন্যেই তিনি এমন জোর করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।"[৭২]

প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণদয়ালের অসুস্থতার সুবাদে গোরা ছুটে এলো তাঁর শয্যাপাশে এবং তার জন্মবৃত্তান্ত জানতে পারলো। কৃষ্ণদয়াল বল্লেন, "তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়ছো।" "এক মুহূর্তে গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মত হইয়া গেল। শৈশব হইতে এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল। সে যে কী, সে যে কোথায় আছে, তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। তাহার পশ্চাতে অতীত কাল বলিয়া যেন কোন পদার্থই নাই এবং তাহার সম্মুখে তাহার এতকালের এমন একাগ্রলক্ষবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ একেবারে বিলীন হইয়া গেছে। সে যেন কেবল এক মুহূর্ত মাত্রের পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত ভাসিতেছে। তাহার মা নাই,

বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই, সমস্তই একটা কেবল 'না'। সে কী ধরিবে, কী করিবে, আবার কোন দিকে লক্ষ্য স্থির করিবে। আবার দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে কর্মের উপকরণ সকল কোথা হইতে কেমন করিয়া সংগ্রহ করিয়া তুলিবে। এই দিক-চিহ্নহীন অদ্ভুত শূন্যের মধ্যে গোরা নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া কেহ তাহাকে দ্বিতীয় কথাটি বলিতে সাহস করিল না।"[৭৩] ইংরেজ ডাক্তার এলো। আজ গোরা পরম ঔৎসুক্যের সঙ্গে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলো। তার মনে হ'ল, "এই লোকটাই কি এখানে আমার সকলের চেয়ে আত্মীয়?"[৭৪] গোরা আনন্দময়ীর কাছে এ সত্য গোপনের কারণ জানতে চাইল। যথারীতি বাংলাদেশের মায়ের মত, আনন্দময়ী নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ লইলেন, কহিলেন, "বাপ তোকে পাছে হারাই এই ভয়েই আমি এত পাপ করেছি। শেষে যদি তাই ঘটে, তুই যদি আজ আমাকে ছেড়ে যাস, তাহ'লে কাউকে দোষ দিতে পারব না, গোরা, কিন্তু সে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে যে বাপ।"[৭৫] কৃষ্ণদয়াল প্রচারের ভয়ে ত্রস্ত শঙ্কিত হলেন। গোরাকে এ ঘটনা গোপন রাখতে বল্লেন। আজ স্পষ্টবাদী গোরা নির্বাক। যাঁকে গোরা মূর্তিমান ধর্ম বলে প্রত্যক্ষ করেছে, যাঁর কাছে মানুষ সবার ওপরে সে পরেশবাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললো, "আমি হিন্দু নই, আজ খবর পেয়েছি আমি মিউটিনির সময়কার কুড়োনো ছেলে। আমার বাপ আইরিশম্যান। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেব মন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোন পংক্তিতে কোন জায়গায় আমার আহারের আসন নেই। ···আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু। আমি যে পতিত হব, ব্রাত্য হব, সে ভয় আর আমার নেই—আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।"[৭৬]

ঘটনার আকস্মিকতায় পরেশ সুচরিতা দু'জনেই বিস্মিত এবং মূক। একে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ওর সান্ত্বনা ওর আত্মোপলব্ধিতে। গোরা বলেছে, "এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্য সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি। —একটা না একটা জায়গায় বেধেছে—সেই সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত জীবন দিন-রাত কেবলি চেষ্টা করে এসেছি—শ্রদ্ধার ভিত্তিকে

খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোন কাজই করতে পারিনি—সেই আমার একটি মাত্র সাধনা ছিল। সেই জন্যই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যদৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বার বার ফিরে এসেছি—আমি একটি নিষ্কণ্টক, নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্য এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি। আজ এক মুহূর্তেই আমার সে ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মত উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালমন্দ, সুখদুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁছেচে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভেতরকার ক্ষেত্র নয়, সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ ক্ষেত্র।"[৭৭] আত্মার অর্গল না ভাঙ্গতে পারলে এই যথার্থ কল্যাণ ক্ষেত্রে পৌঁছানো যায় না, তাই ধর্মীয় অহঙ্কারে নিজেকে আবদ্ধ করে অপরের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর নয়। নির্বাক উত্তেজিত পরেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গোরা বললো, "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"[৭৮] এই তো প্রকৃত দেশ সেবকের কথা। মহাত্মাগান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরমাত্মীয় এই ভারতবাসী। গোরা অতীতে অনেক চেষ্টা করেও তার ব্রাহ্মণত্বের সিংহাসন থেকে সাধারণের পংক্তিতে নেমে আসতে পারেনি। কিন্তু আজ বিধাতা তার সকল দম্ভ, অহঙ্কার, অলৌকিক উপায়ে চূর্ণ করে দিলেন। গোরা বলেছে, "আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতোদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।"[৭৯] এই উপলব্ধি নিয়েই আজ গোরা এসেছে পরেশবাবুর কাছে, "আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেইজন্যে আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পাননি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন—যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না—

যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা ন'ন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"[৮০] বর্তমান ভারতের জন্য এ অনুভূতি কতোখানি কাম্য তা স্বদেশ সচেতন ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধি, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম। এঁরা বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ ন'ন কারণ তাঁরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ

ইসলামে এ জীবনাচরণ অনুমোদিত। সেখানে ভূমিকে উপেক্ষা করে ভূমার সাধনার বিধান নেই।

এ নিবন্ধে আমি উপন্যাসের আঙ্গিক, রচনাশৈলী, শিল্পরীতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি। 'গোরা' উপন্যাসে নানা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে যে ধর্ম ও দেশপ্রেমের প্রতি ঔপন্যাসিক দিক্ নির্দেশ করেছেন তার বিশ্লেষণই ছিল আমার কাম্য। তাই এর নাটকীয় পরিসমাপ্তি অপেক্ষা গোরার উচ্চারিত শেষ কয়েকটি ছত্র আমাদের কাছে অধিক গ্রহণীয়। "গোরা কহিল, মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"[৮১] এই তো রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ যার প্রতিটি প্রাণী তাঁর আত্মার আত্মীয়। এ কারণে বিশেষ কোনও মতবাদী রাজনৈতিক দল তাঁকে বাঁধতে পারেনি। অনশন-বন্দী নজরুল ইসলামের জন্য যেমন তাঁর মন কেঁদেছে তেমনি সুভাষ বসুর জন্য তিনি তাঁর আজন্ম সুহৃদ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও মত পার্থক্যে যেতে দ্বিধা করেননি।

ভারতবর্ষ তাঁর কাছে ভারততীর্থ, এ মহামানবের মিলনক্ষেত্র। এ শুধু হিন্দুরও নয় মুসলমানেরও নয়, বৌদ্ধরও নয়, খৃষ্টানেরও নয়। সকলের আবাসভূমি এই ভারত। সুতরাং এর কল্যাণ যদি কেউ করতে চায়, এর সেবায় যদি কেউ আগ্রহী হয় তাহ'লে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পরিত্যাগ করে আসতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বকবিকে ডক্টরেট উপাধি দিলে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাতও করেননি। তিনি বিশ্বাস করেছেন :

বলে যাব দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।
(সেঁজুতি : জন্মদিন)

মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষা করেছেন:
ঐ মহামানব আসে...

আমরা আজও তাঁর পথ চেয়ে বসে আছি, যিনি মানুষকে শোনাবেন মানবতার বাণী, প্রেমের রাখীবন্ধনে বিশ্ববিবেক বাঁধা পড়বে! যে হিংসা-উন্মত্ত পৃথ্বীকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বেদনাতুর হয়েছিলেন সে পৃথিবীর রূপ ও রঙ্ আরও কুৎসিত আরও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে আজ হানাহানির শেষ নেই। রাজনৈতিক যূপ কাষ্ঠে নিরীহ মানবসন্তান আজ উৎসর্গীত ধর্মবলি। আজ রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত ও প্রদর্শিত মানবধর্মের প্রচার ও প্রসার একান্ত কাম্য। বাইরের কঙ্কাল, অস্থিপঞ্জর নয় হৃদয় কন্দরের স্পন্দন আজ আমাদের মুক্তির পথ দেখাবে। আর কতো দিন এই মূঢ়, মূক ম্লান মুখেরা অপেক্ষায় থাকবে? বিশ্ববিবেক কি জাগ্রত হবে না? আণবিক শক্তির হিরোশিমা নাগাসাকির হত্যাযজ্ঞের মূল্যেও কি আমরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবো না? সম্ভবতঃ বিনয়ের মত আমরা শুধু যুগে যুগে প্রশ্ন করে যাবো। কবে আসবেন পরেশবাবু তা ভবিতব্যই জানেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে দেবতার চেয়ে মানুষ অনেক বড় ছিল। সেই মন্ত্রেই আজ জগৎ দীপ্ত হোক। সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ সবাই মানুষ, জীবন-ধারণের অধিকার সকলেরই সমান। অন্ততঃ সে সুযোগ ধর্মকে হাতিয়ার করে পাওয়া যায় না এ সত্য আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট।

তথ্যনির্দেশ

১ 'গোরা', রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-শ্রাবণ, ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ—আশ্বিন ১৩৬৩

২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩
৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯
১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫
১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-৫৩
১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫
১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬
১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩
২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯
২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯
২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১
২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১
২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩
২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮
৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১
৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩
৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১
৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯
৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫
৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫
৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪

৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫
৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১
৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩
৪০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩
৪১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬
৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১
৪৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২
৪৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭
৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮
৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪
৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮১
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮২
৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩
৫০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৪
৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১
৫২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯
৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১
৫৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭
৫৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৮
৫৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯
৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩০
৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩০
৫৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩১
৬০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩১
৬১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩২
৬২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৩
৬৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৫
৬৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৮
৬৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৮
৬৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৯
৬৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪০
৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৮

৬৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫০
৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫২
৭১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩
৭২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৭
৭৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬০
৭৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭
৭৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭
৭৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯
৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯-৭০
৭৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭০
৭৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১
৮০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১
৮১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২